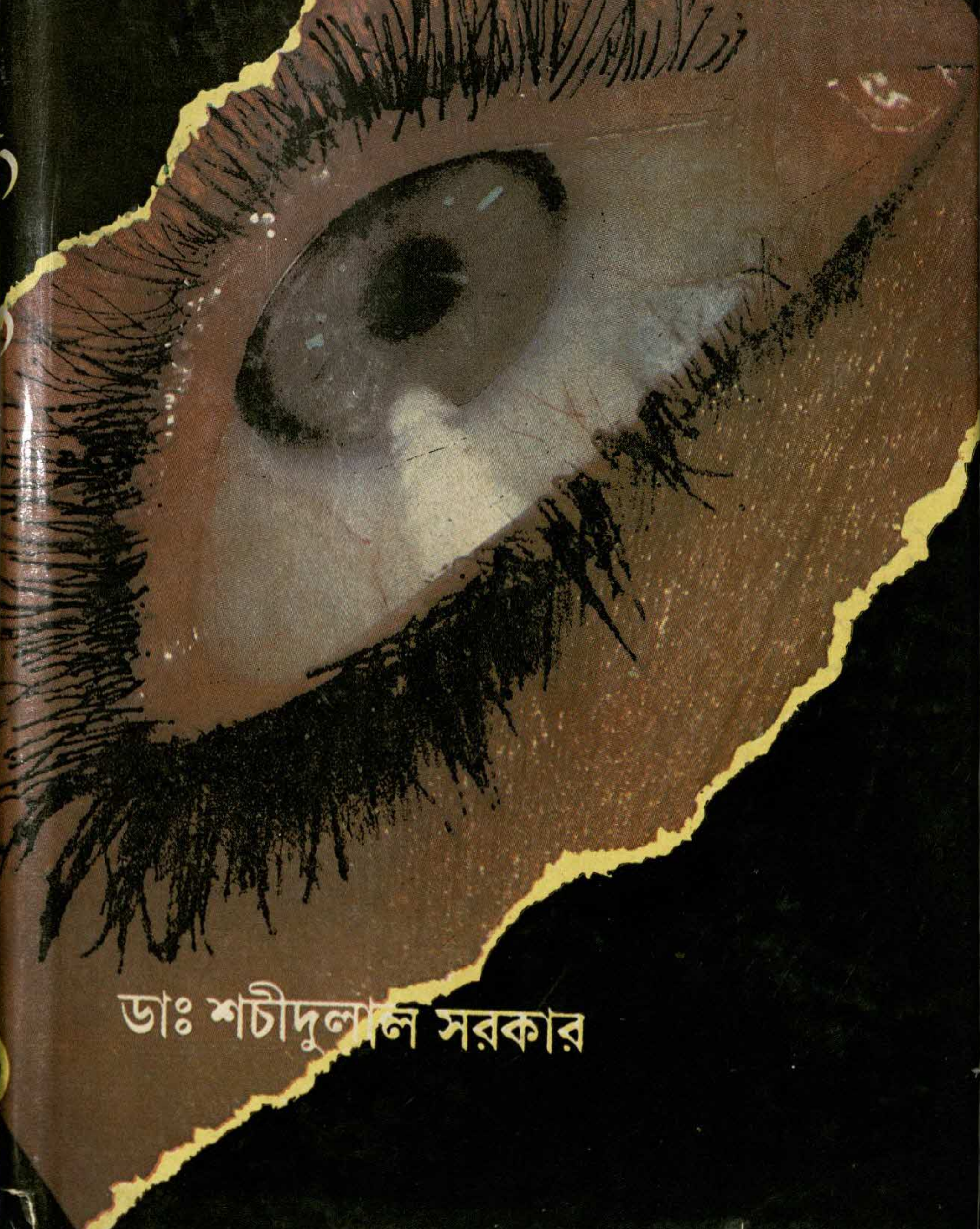
চোখঃ ব্যাধি ও নিরাময়



ডাঃ শচীদুলাল সরকার

চোখ

ব্যাধি ও নিরাময়

ডাঃ শচীদুলাল সরকার

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
মাঘ ১৩৯৮

প্রকাশক:
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

ISBN-81-7079-062-X

লেজার কম্পোজ :
এ্যাট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক :
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

দাম ৩০ টাকা
Rupees Thirty only

ভূমিকার পরিবর্তে

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) আছে – চোখ, কান, নাক, চামড়া ও জিভ । এর সবগুলিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু এর মধ্যে চোখের গুরুত্ব যে কতটা তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সচেতন নই । অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি–যেমন কান, নাক, ইত্যাদি বিকল হ'য়ে গেলে আমাদের অনেক অসুবিধা হয় ঠিকই কিন্তু চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আমরা অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়ি ।

কথায় আছে, লোকে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝেনা, কথাটা কিন্তু চোখের ক্ষেত্রেই বেশি খাটে । দাঁত নষ্ট হ'য়ে গেলে দাঁত বাঁধান যায় কিন্তু চোখ নষ্ট হয়ে গেলে একটা গোটা চোখ বাঁধানর কোনো উপায় এখনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে ।

অথচ আমরা চোখের কতটুকু যত্ন নিই ? চোখের কোনো অসুখ হ'লে ওষুধের দোকানের উপদেশ মত চোখে ওষুধ লাগাই, যার ফল হয়তো বা অনেক সময় বিষময় হয় । অথচ প্রথম অবস্থায় যথার্থ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে অনেক বিপদ সম্ভবতই এড়ান যায়, খরচের দিক বাদ দিলেও ।

তবে চোখ খারাপ হওয়ার আগেই চোখের যত্ন নেওয়া উচিত । এতে অনেক সময় অনেক চোখের রোগ এড়ান যায় । এ-সম্পর্কে নিচে উল্লিখিত কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা উচিত :

১। রোজ দুবার পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধোয়া উচিত । একবার সকালে উঠে মুখ ধোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর একবার রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে ।

২। সাধ্যমত সুষম খাবার খাওয়া উচিত । যার মধ্যে থাকবে শাকসবজি (বিশেষ করে সবুজ পাতাওয়ালা ও হলদে সবজি যেমন শাক, বাঁধাকপি, গাজর, মিষ্টি কুমড়ো), অঙ্কুর বেরোন ছোলা বা যে কোনো ডাল, মৌরলা জাতীয় ছোট মাছ । আধসিদ্ধ ডিম, মাংস, দুধ ইত্যাদি ।

৩। পড়াশুনা করার সময় বই সবসময় চোখ থেকে অন্তত চোদ্দ ইঞ্চি বা তেত্রিশ সেন্টিমিটার দূরে রাখতে হবে । আলোর দিকে মুখ করে বসা উচিত নয় – আলো আসবে বাঁ ও একটু পেছনের দিক থেকে । খুব কড়া আলো বা কম আলো চেখের পক্ষে খারাপ, এতে সহজেই ক্লান্তি

আসে। সূর্যের আলোর কোন বিকল্প নেই, তবে রাত্রে ও যেসব ঘরে পর্যাপ্ত আলো ঢোকেনা সেক্ষেত্রে চল্লিশ ওয়াটের ফ্লুরেসেন্ট টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের কখনই রাত জেগে (রাত সাড়ে দশটা এগারটার পর) পড়া উচিত নয়। আজকাল পাঠ্য বিষয় অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়ে কুলোতে পারে না, তাই রাত জেগে পড়তে হয়। কিন্তু রাত না জেগে অনেক ভোরে উঠে সেই সময়টুকু পুরিয়ে নেওয়া যায়। আর দেখা গেছে যে রাত জেগে পড়ার থেকে ভোরে উঠে পড়লে মনে থাকে বেশি।

৫। যাঁরা ওয়েল্ডিং চিপিং বা লেদ ও গ্রাইন্ডিং মেসিনে কাজ করেন তাঁদের সব সময় প্রতিরক্ষামূলক চশমা পরা উচিত। যাঁরা মোটর সাইকেল বা স্কুটার চালান, হেলমেট পরার মত প্রতিরক্ষামূলক চশমা পরাটাও তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

৬। বাচ্চাদের খেলনার দিকে নজর রাখা উচিত। খুব সুঁচোল বা ধারাল খেলনা বাদ দিতে হবে।

৭। বছরে অন্তত একবার বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করানো উচিত। যাঁদের বংশে গ্লকোমা জাতীয় বংশগত রোগ আছে তাঁদের ছমাস অন্তর চোখ দেখান উচিত।

ওপরের নিয়ম মেনে চললে চোখের অনেক বিপদ এড়ান সম্ভব হবে। পরিশেষে যাঁদের জন্য এই বই লেখা সেই সাধারণ পাঠকরা যদি উপকৃত হ'ন তাহলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আর এই বইয়ের যা ভুল ত্রুটি তা যদি দেখিয়ে দেন বা অন্য কোনো পরামর্শ জানান তাহ'লে কৃতজ্ঞ থাকব।

শচীদুলালসরকার

'স্থাবর'
সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর - ১৬

আমার সহধর্মিণী

শ্রীমতী অঞ্জলি সরকার-কে

যাঁর অবিরাম তাড়নার ফলেই বইটি শেষ করা সম্ভব হ'য়েছে।

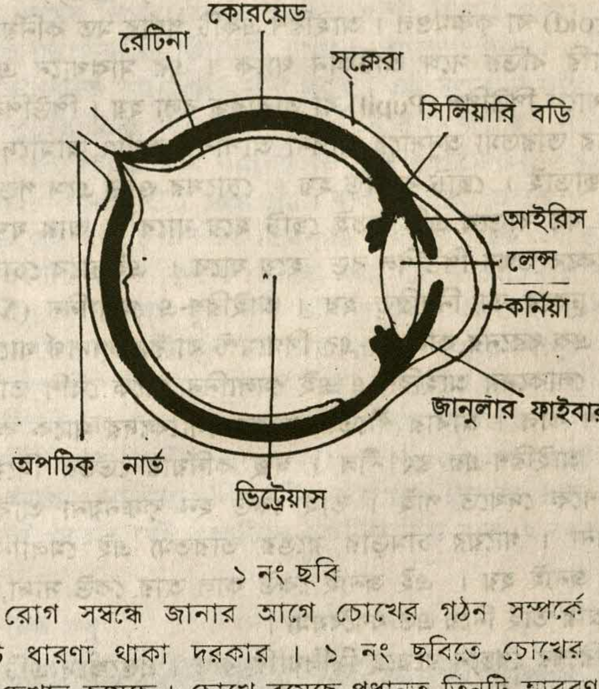
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ বই লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়েছি। দুর্গাপুরের দত্ত পুস্তকালয়ের শ্রী সত্যরঞ্জন দত্ত ও রীডিং এম্পোরিয়ামের শ্রী রাজেশ লাহাকার কলকাতায় প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন। দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রী সুবীর ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপিটি পড়ে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আর শ্রী নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ অবশ্য দরকার। 'নন্দদার সাহায্য না পেলে এ-বই হয়তো কোনোদিন ছাপার অক্ষরের মুখ দেখতো না। আর প্রকাশক শ্রী সুধাংশুশেখর দে যেভাবে আমার মতো একজন নতুন লেখকের দিকে সৌজন্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা কখনই ভুলব না। ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের কাউকে ছোট করতে চাইনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চোখের গঠন



১ নং ছবি

চোখের রোগ সম্বন্ধে জানার আগে চোখের গঠন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। ১ নং ছবিতে চোখের একটি প্রস্থচ্ছেদ দেখান হয়েছে। চোখে রয়েছে প্রধানত তিনটি আবরণ। সব থেকে বাইরের আবরণটির সামনের এক তৃতীয়াংশের নাম কর্নিয়া (Cornea) বা অচ্ছোদপটল। কর্নিয়া স্বচ্ছ ও এর ভেতর দিয়েই আলো চোখে প্রবেশ করে। তাই কর্নিয়াকে চোখের জানলা বলা হয়। কর্নিয়া খুব নরম কলা (Tissue), সেজন্য এটি সহজেই আহত হয়। তাছাড়া কর্নিয়াতে আছে প্রচুর নার্ভ তাই এটি খুব সংবেদনশীল। এই সংবেদনশীলতার জন্যই চোখে সামান্য একটু ধুলোর কণা পড়লেও আমরা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠি। তাই নিজে নরম হয়েও কর্নিয়া পরোক্ষভাবে চোখের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে চোখের সামান্য আঘাত সম্পর্কেও আমাদের সচেতন করে দিয়ে। বাইরের আবরণের বাকি দুই-তৃতীয়াংশের নাম স্‌ক্লেরা (sclera)। স্‌ক্লেরার রং সাদা ও

এটি বেশ শক্ত। চোখের একটি শক্ত আবরণ হিসাবেই স্ক্লেরা কাজ করে। বাইরে থেকে কর্নিয়ার চারপাশে এই সাদা স্ক্লেরার খানিকটা দেখা যায়। কর্নিয়া ও স্ক্লেরার ভেতরের স্তরটির নাম ইউভিয়া (Uvea)। এর তিনটি ভাগ, সামনে থেকে পেছনে যথাক্রমে আইরিশ (Iris) বা কনীনিকা, সিলিয়ারি বডি (Ciliary Body) ও কোরয়েড (Choroid) বা কৃষ্ণমণ্ডল। আইরিশ একটি পর্দার মত কর্নিয়ার পেছনে সিলিয়ারি বডির সঙ্গে আটকান থাকে। এর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে যাকে পিউপিল (Pupil) বা তারারন্ধ্র বলা হয়। পিউপিল আলোর তীব্রতার তারতম্য অনুসারে আপনা আপনি (অর্থাৎ আমাদের সচেতন প্রয়াস ছাড়াই) ছোট বা বড় হয়। চোখের ওপর এসে পড়া আলোর তীব্রতা যত বাড়বে এটি ততই ছোট হয়ে যাবে। আর যখন আলো কম থাকবে তখন পিউপিল বড় হয়ে যাবে। এইভাবে চোখে কতটা আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। আইরিশ-এ মেলানিন (Melanin) নামের এক ধরনের কাল রং-এর পিগমেন্ট বা রঞ্জকপদার্থ থাকে। গরম দেশের লোকদের আইরিশ-এ এই মেলানিন থাকে বেশি তাই তাদের আইরিশ কাল। আবার শীতের দেশের লোকেদের থাকে কম। তাই তাদের আইরিশ-এর রং নীল। স্বচ্ছ কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে আমরা আইরিশকে দেখতে পাই। তাই কেউ হন কৃষ্ণনয়না আবার কেউ নীলনয়না। গায়ের চামড়ার রঙের তারতম্য এই মেলানিনের কম বেশির জন্যই হয়। এই জন্যই কেউ কাল আর কেউ সাদা, কেউ বা পীত, আর তাই নিয়ে এত বর্ণবৈষম্য।

আইরিশের পেছনে রয়েছে সিলিয়ারি বডি। প্রস্থচ্ছেদে এটি ত্রিভুজের মত দেখায়। সিলিয়ারি বডি একটি রিং-এর মত স্ক্লেরার ভেতরের পিঠে আটকান আছে। সিলিয়ারি বডিতে আছে কয়েক ধরনের পেশী যার সংকোচন (Contraction) ও শ্লথনের (relaxation) ফলে সিলিয়ারি বডির রিংটির ব্যাস যথাক্রমে কমে বা বাড়ে। দেখার ব্যাপারে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

সিলিয়ারি বডির পেছনে রয়েছে কোরয়েড। সিলিয়ারি বডি থেকে অপটিক নার্ভ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এটি প্রধানত রক্তবাহী ধমনী, শিরা ও রঞ্জকপদার্থ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। রেটিনার একটি বৃহৎ অংশকে এটি পুষ্টি যোগায়। কোরয়েডেও আছে মেলানিন, জাতিভেদে যার পরিমাণের তারতম্য হয়। সব থেকে ভেতরের স্তরটির নাম রেটিনা

(Retina) বা অক্ষিপট । এটি খুব পাতলা ও স্বচ্ছ একটি পর্দা । নানা ধরনের নার্ভকোষ ও নার্ভতন্তু দিয়ে এটি তৈরি । এর মধ্যে আছে রড (Rod) ও কোন্ (Cone) নামের গ্রাহী কোষ (receptor cell) । এক একটি চোখে রেটিনায় প্রায় 12.5 কোটি রড ও 70 লক্ষ কোন্ থাকে । রড কম আলোতে (যেমন সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রিতে) ও কোন্ জোরাল আলোতে (যেমন দিনের বেলা) দেখতে ও রং চিনতে সাহায্য করে । রডে আছে রডপ্সিন বা ভিসুয়াল পার্পল্ – আলোর প্রভাবে এটি ভেঙে যায় ও রেটিনাতে সংবেদনের সৃষ্টি করে । এই সংবেদন মস্তিষ্কে গিয়ে দেখার অনুভূতি তৈরি করে । কোন্-এ তিন রকম রঙের (নীল, সবুজ ও লাল) জন্য আছে তিন ধরনের ভিসুয়াল পিগমেন্ট । কোন্ বেশি থাকে রেটিনার ম্যাকুলা (Macula) বলে পরিচিত অংশে । 4.5 মি মি ব্যাসের এই অংশটি অপটিক ডিস্ক-এর বাইরের দিকে অবস্থিত । এই ম্যাকুলা অংশটি যাকে কেন্দ্রীয় রেটিনা বলা হয় – রেটিনার সবথেকে সংবেদনশীল অংশ এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি এই ম্যাকুলার অংশেই সম্ভব হয় । যেমন আমাদের দৃশ্যপটে অবস্থিত প্রায় পাশাপাশি দুটি বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব এই অংশটির সাহায্যে বোঝা যায় । তাছাড়া কোন্-এর সাহায্যে ম্যাকুলা দিয়েই রং চেনা যায় । রেটিনা থেকে নার্ভতন্তু এসে চোখের পেছনে সৃষ্টি হয়েছে অপটিক নার্ভের (Optic Nerve) এতে প্রায় 10 লক্ষ নার্ভতন্তু আছে । নার্ভতন্তুগুলি রেটিনার পেছনে যেখানে এসে অপটিক নার্ভের সৃষ্টি করেছে সেই অংশটিকে অপটিক ডিস্ক বলে (২ নং ছবি) ।

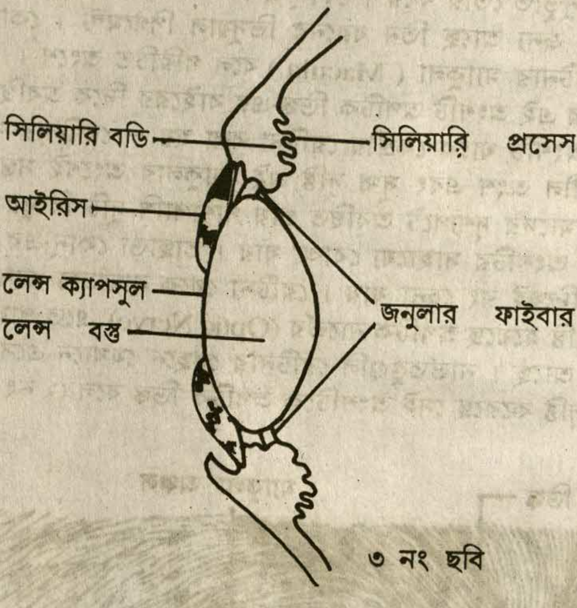


২ নং ছবি

ক্রিস্টালাইন লেন্স (Crystalline Lens) (৩ নং ছবি)

চোখের ভিতরে এছাড়া আছে ক্রিস্টালাইন লেন্স। এটি একটি উভতল লেন্স (Biconvex Lens) ।

ক্রিস্টালাইন লেন্স সিলিয়ারি বডি থেকে জোনুলার ফাইবার (Zonular Fibre) নামের কতকগুলি খুব সূক্ষ্মতন্তু দিয়ে ঝোলান থাকে । লেন্সের বাইরের আবরণ হিসাবে আছে একটি ক্যাপসুল (Capsule) আর তার মধ্যে আছে জেলীর মত নরম লেন্স বস্তু (Lens matter)— পাকা আমের



৩ নং ছবি

খোসার ভেতর নরম শাঁসের মত । লেন্স ক্যাপসুল রবারের মত স্থিতিস্থাপক । শ্লথনের (relaxation) সময় সিলিয়ারি বডির রিংটি বড় হয়ে যায় ও জোনুলার ফাইবারগুলি লেন্স ক্যাপসুলকে চারপাশ থেকে টেনে ধরে ফলে লেন্সটি চ্যাপ্টা হয়ে যায় ও এর তলের বক্রতা কমে যায় । আবার সিলিয়ারি বডির সংকোচনের সময় রিংটি ছোট হয়ে যাবার ফলে জোনুলার ফাইবারগুলি ঢিলা হ'য়ে যায় ও লেন্সটি বর্তুলাকার ধারণ করে অর্থাৎ তার তলের বক্রতা বেড়ে যায় । আমরা পরে দেখব যে চোখ প্রয়োজন মত এইভাবে লেন্সের তলের বক্রতার পরিবর্তন

করে তার পাওয়ার বাড়িয়ে-কমিয়ে নেয়। দেখার ব্যাপারে-এর একটা বিরাট গুরুত্ব আছে।

ভিট্রেয়াস হিউমার (Vitreus humour)

ভিট্রেয়াস হিউমার একটি স্বচ্ছ জেলির মত (Hydrogel)। এটি লেন্সের ও রেটিনার মাঝখানে চোখের ফাঁকটি ভর্তি করে রাখে। ভিট্রেয়াস রেটিনাকে কোরয়েডের সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে। আর স্বচ্ছ হওয়ার দরুন আলো সহজেই এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। যদি কোন কারণে এটি তার স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে (যেমন উচ্চ রক্ত চাপে বা ডায়াবেটিসে ভিট্রেয়াসে রক্তক্ষরণ হ'লে) তাহ'লে দৃষ্টিশক্তি ভীষণ ভাবে কমে যেতে পারে।

কন্‌জাংক্‌টাইভা : (Conjunctiva) নেত্রবর্ত্ম কলা

কন্‌জাংক্‌টাইভা কথাটির সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস কথাটির দৌলতে। কন্‌জাংক্‌টাইভা একটি পাতলা পর্দার মত কর্নিয়ার চারপাশ থেকে স্‌ক্লেরার দৃশ্যমান অংশটুকু ও চোখের পাতার ভেতরের দিকটি ঢেকে রাখে। স্‌ক্লেরার ওপর এটি লাগান থাকে আলগা ভাবে (অনেকটা আমাদের গায়ে পরে থাকা জামার মত) কিন্তু চোখের পাতার ভেতরের দিকে এটি শক্তভাবে আটকানো থাকে। তাই কোন কোন অসুখে (যেমন অ্যালার্জিতে) স্‌ক্লেরার ওপর থাকা কন্‌জাংক্‌টাইভার নিচে জলীয় পদার্থ জমলে এটি ফুলে ওঠে ও অনেকে মনে করেন যে 'চোখটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে'।

চোখের পাতা (Eye lids)

চোখের ওপরে ও নিচে একটি করে দুটি পাতা বা অক্ষিপল্লব। চোখকে রক্ষা করার ব্যাপারে এই পাতা দুটি একটি বড় ভূমিকা পালন করে। একমাত্র ঘুমোন ছাড়া চোখের পাতা সব সময়েই পড়ে ও মানুষের ক্ষেত্রে এটা হয় মিনিটে পড়পড়তা পনের বার। জঙ্গলের রাজা সিংহ এ ব্যাপারে আয়েশী – তার চোখের পাতা পড়ে মিনিটে একবার। আবার সদা চঞ্চল শাখামৃগ চোখের পাতা ফেলার ব্যাপারেও চঞ্চল – তার চোখের পাতা পড়ে মিনিটে পঁয়তাল্লিশ বার। চোখের পাতা পড়াটা অনেকটা মোটর গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিন ওয়াইপারের মত কাজ করে, কারণ

এর ফলে চোখের জল কন্‌জাংক্‌টাইভা ও কর্নিয়ার ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে যায় ও এইভাবে এদের পরিষ্কার ও আর্দ্র রাখে। চোখের জল থেকে কর্নিয়া পুষ্টি গ্রহণ করে ও এর একটা সংক্রমণ প্রতিরোধক ভূমিকাও আছে। কারণ চোখের জলে কয়েকটি রাসায়নিক যৌগ যেমন লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি আছে যারা তাদের জীবাণু - ধ্বংসী ক্ষমতার দ্বারা চোখকে সক্রমণের থেকে রক্ষা করে। আমাদের চোখের পাতা না থাকলে কর্নিয়া শুকিয়ে গিয়ে অস্বচ্ছ হয়ে যেত ও আমরা দেখতে পেতাম না। চোখে কতটা আলো ঢুকবে প্রয়োজন হ'লে চোখের পাতা তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে – জোরালো আলো পড়লে চোখের উপরের ও নিচের পাতার মাঝখানের ফাঁকটি আপনা-আপনি ছোট হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

চোখের পাতার কিনারায় যে আইল্যাস বা অক্ষিপক্ষ রয়েছে তারও একটা রক্ষকের ভূমিকা আছে। ওপরের পাতায় একশ থেকে দেড়শ ও নিচের পাতায় তার অর্ধেক আইল্যাস থাকে। এই আইল্যাসগুলির গোড়ায় আছে নার্ভজালিকা (Nerve plexus) । তাই আইল্যাসকে যদি কিছু স্পর্শ করে (যেমন যদি সামান্য ধূলি-কণাও এর উপর পড়ে) তাহলে আইল্যাসের উপর যে অতি সামান্য চাপ পড়ে তাতেই এই নার্ভজালিকাটি সংবেদিত হ'য়ে ওঠে ও মস্তিষ্কে তার খবর পৌঁছে গিয়ে চোখের পাতা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস (Lachrimal apparatus)

এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখের পাতা

চোখের পাতার নানা ধরনের অসুখ হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কটির সঙ্গে আমাদের বেশি পরিচয় ঘটে সেগুলি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হ'ল।

অন্‌জনী :

আমাদের চোখের পাতায় কয়েক ধরনের গ্রন্থি (Gland) আছে। যেমন মাইবোমিয়ান গ্রন্থি, জাইসের গ্রন্থি, মোলের গ্রন্থি। এছাড়া রয়েছে অক্ষিপক্ষ বা আইল্যাসের গোড়ায় হেয়ারফলিক্‌ল্। এগুলির সংক্রমণ ও প্রদাহ থেকেই অন্‌জনী হয়।

আইল্যাসের গোড়ায় হেয়ার ফলিক্‌ল্-এ বা তার পাশাপাশি জাইসের গ্রন্থিতে সংক্রমণ হ'তে পারে। একে চোখের লোম ফোঁড়া বলা যায়। সংক্রামিত অংশটি ফুলে উঠে লাল হয়ে যায় ও খুব ব্যথা হয়। দু-একদিনের মধ্যে পুঁজে ভরা একটি ছোট ফুসকুড়ির মত দেখা যায়। এরকম হ'লে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আক্রান্ত চোখের পাতায় গরম সেঁক দিতে হবে। একটি কাঠের চামচ, ডাল ঘাঁটা বা কাঠির ডগায় খানিকটা তুলো জড়িয়ে সেটা ফুটন্ত জলে চুবিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ রেখে চোখের তিন-চার ইঞ্চি দূরে ধরতে হবে যাতে তুলো থেকে বেরিয়ে আসা বাষ্প চোখের পাতায় লাগে। অথবা একটি কেটলিতে জল ফুটিয়ে নিতে হবে। কেটলিটি আগুন থেকে নামিয়ে তার ঢাকনাটি খুলে দিলে যে গরম বাষ্প বেরোবে তা বন্ধ চোখের পাতার ওপর নিতে হ'বে। এরকম দিনে তিন-চার বার ও প্রতিবার পাঁচ মিনিট করে করতে হবে। এর সঙ্গে নিওস্পোরিন, সোফ্রামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন জাতীয় চোখের প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে সেঁক নেওয়ার পর পর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

মাইবোমিয়ান গ্রন্থির প্রদাহ হয়ে ফুলে উঠলে ও ব্যথা হলে তাকে ক্যালাজিয়ন (Chalazion) বলে। এক্ষেত্রেও প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সেঁক ও মলম ব্যবহার করতে হ'বে ও দু-এক দিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ক্যালাজিয়নের প্রাথমিক উপসর্গগুলি কেটে যাবার পর অনেক সময় চোখের পাতার মধ্যে এক বা তার বেশি গোটার মত থেকে যায়। এটা বাইরে থেকে বোঝা না যেতে পারে, চোখের পাতার ওপর আঙুল দিয়ে আলতোভাবে টিপলে বোঝা যায়। ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ থাকে না। এরকম হ'লে বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি একটি ছোট অপারেশন করে এটা ঠিক করে দেবেন। অপারেশনটি করা হয় চোখের পাতার ভেতরের দিক থেকে সুতরাং অপারেশনের পর চোখের পাতার চামড়ার ওপর কোন দাগ থেকে যাবার ভয় নেই।

অনেকের মতে অল্পমাত্রার প্রতিসরণ দোষ – বিশেষ করে সিলিণ্ড্রিক্যাল পাওয়ারের প্রয়োজন থাকলে – বার বার ক্যালাজিয়ন হয় ও উপযুক্ত পাওয়ারের চশমা নিলে এটা বন্ধ হয়ে যায়।

ব্লেফেরাইটিস (Blepheritis)

ব্লেফেরাইটিস চোখের পাতার কিনারার (যেখানে আই-ল্যাসগুলি রয়েছে) প্রদাহ।

ব্লেফেরাইটিস দুরকমের হয় – আলসারেটিভ (Ulcerative) ও স্কোয়ামাস (Squamous)। আলসারেটিভ ব্লেফেরাইটিসে চোখের পাতার কিনারা লাল হ'য়ে যায় ও আইল্যাসের গোড়ায় হলদেটে পুঁজ শক্ত হয়ে জমে থাকে। আইল্যাস পড়ে যায় ও অনেক সময় এরা তাদের স্বাভাবিক বিন্যাস হারিয়ে ফেলে কর্নিয়ার দিকে ঘুরে যায় ও কর্নিয়ার ওপর ঘষতে থাকে। এর ফলে কর্নিয়াল আলসারও হ'তে পারে।

এরকম হ'লে একটুকরো তুলো গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে চোখ আলতোভাবে বন্ধ রেখে চোখের পাতার কিনারা ভাল করে ঐ তুলো দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরকম দিনে দু-তিন বার পরিষ্কার করতে হবে ও প্রতিবার পরিষ্কার করার পর চোখের প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে।

স্কোয়ামাস ব্লেফেরাইটিস :

এতে পাতার কিনারা লাল হ'য়ে ওঠে, চুলকায় ও আইল্যাসে সাদা খুসকির মত দেখা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাধারণত মাথাতেও খুসকি থাকে। এ ক্ষেত্রে পাতার কিনারা দিনের দু-তিন বার পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে কোন বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন শ্যাম্পু চোখের ভেতরে না চলে যায়। এজন্য চোখের পাতা আলতোভাবে বন্ধ রেখে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে ও পরিষ্কার করা হয়ে গেলে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে তারপর চোখ খুলতে হবে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত প্রথম দিন সাতেক চোখের হাইড্রোকর্টিসন মলম ও পরে প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে। মাথার খুসকির জন্য খুসকির শ্যাম্পু (সেলসান জাতীয়) প্রথম মাসে সপ্তাহে

দু-বার ও পরে সপ্তাহে একবার ব্যবহার করতে হবে। অনেক বিশেষজ্ঞ চুলে তেল ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। কাজল বা মাসকারা ব্যবহার বন্ধ রাখতে হ'বে। যথেষ্ট পরিমাণে (প্রতিদিন অন্তত একশ গ্রাম) পাতাওয়ালা সবুজ শাক্‌সবজী খেতে হবে।

চোখে উকুন :

চোখের পাতার কিনারায়, আইল্যাসের গোড়ায় অনেক সময় উকুন বাসা বাঁধে। যাঁদের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম তাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। এর থেকে ব্লেফেরাইটিস হয় ও চোখের পাতা চুলকায়। এরকম হ'লে পরিষ্কার তুলো দিয়ে ঘষে ঘষে (চোখ আলতোভাবে বন্ধ রেখে) উকুনগুলি তুলে ফেলতে হবে ও জীবাণু সংক্রমণ এড়ানোর জন্য প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম লাগাতে হবে। সপ্তাহ খানেক দিনে দু বার এরকম করলেই এগুলি চলে যায়।

কন্‌টাক্‌টডারমাটাইটিস (Contactdermatitis)

কন্‌টাক্‌ট্‌ডারমাটাইটিস্‌ শরীরের অন্য জায়গার মতো চোখের পাতাতেও হতে পারে। এতে চোখের পাতা চুলকায়, লাল হ'য়ে যায় ও ফুলে ওঠে। চোখে ব্যবহার করা ড্রপ বা মলম ও কসমেটিক্‌স্‌ থেকে অ্যালার্জি হয়ে কন্‌টাক্‌ট্‌ ডারমাটাইটিস হতে পারে। অনেক সময় চোখের পাতায় না হলেও চশমার ফ্রেম থেকে চোখের চারপাশে কনটাক্‌ট্‌ ডারমাটাইটিস হয়। নাকের দুপাশে, চোখের নিচের পাতার তলায় – অর্থাৎ যেখানে ফ্রেম চামড়ার সংস্পর্শে আসছে সেখানে কালচে দাগ হ'য়ে যায় ও চুলকায়। এরকম হলে ফ্রেম পাল্টাতে হবে। পলিমার ফ্রেম হলে মেটাল ফ্রেম ও মেটাল ফ্রেম হলে পলিমার নিতে হবে। মেটাল ফ্রেমের নোজপ্যাড দুটি অনেক সময় প্লাস্টিকের হয়। স্বর্ণকারকে বললে তিনি এ দুটি পাল্টে রুপোর প্যাড লাগিয়ে দেবেন – রুপো বা রুপাইয়াতে সাধারণত কারোর অ্যালার্জি থাকে না। চোখে ব্যবহার করা হচ্ছে না এমন জিনিস থেকেও (যেমন ডেটারজেন্ট, পালিশ ইত্যাদি) চোখের পাতায় অ্যালার্জি হতে পারে। সাধারণত এগুলি হাত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর আঙুল মারফত চোখে লাগে। এজন্য এসব জিনিস ব্যবহার করার পর ভাল করে হাত ধোয়া উচিত।

চোখের পাতায় কনটাক্‌ট্‌ ডারমাটাইটিস হলে যা থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটি আগে বন্ধ করতে হবে – তা না হলে কোন চিকিৎসাই কার্যকরী হবে না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত হাইড্রোকর্টিসন মলম ব্যবহার করলে দ্রুত উপশম হয় তবে এটি বেশিদিন লাগান উচিত নয়। কাঁচা হলুদ ও চন্দন বেটে লাগালেও চুলকানি কমে। এ ছাড়া ক্যালা-ড্রিল জাতীয় লোশন বা ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে এটি চোখের ভেতর না চলে যায়।

ট্রিকিয়াসিস (Trichiasis)

ট্রিকিয়াসিস হলে আইল্যাসগুলি তাদের স্বাভাবিক বিন্যাস হারিয়ে চোখের দিকে ঘুরে যায়। আগে বলা হয়েছে যে ব্লেফেরাইটিস থেকে এটা হ'তে পারে তবে অনেক সময় কোন আপাত কারণ ছাড়া বা জন্মগতও হয়। ট্রিকিয়াসিস হ'লে যে ল্যাসগুলি চোখের দিকে ঘুরে গেছে সেগুলি তুলে ফেলতে হবে (অবশ্য ল্যাসগুলি যদি কর্নিয়াকে স্পর্শ করে তবেই)। এর জন্য মহিলাদের আইব্রাও প্লাগ করার ফরসেপ্‌স্‌ ব্যবহার করা চলবে (দেখতে হবে ফরসেপসের পাশগুলি যেন ধারাল না হয়)। কয়েক সপ্তাহ পর পরই এটা করতে হবে। এটা অবশ্য দু-চারটা ল্যাসের ক্ষেত্রেই সম্ভব। কিন্তু যদি চোখ লাল হয়ে যায়, জল পড়ে বা আলো সহ্য না হয় অথবা যদি অনেকগুলি আই-ল্যাস ঘুরে যায় ও নিজেদের তুলে ফেলার অসুবিধা থাকে তাহ'লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হ'বে। তিনি ইলেকট্রোলাইসিস বা চোখের পাতার ওপর অপারেশন করে এটা ঠিক করে দেবেন।

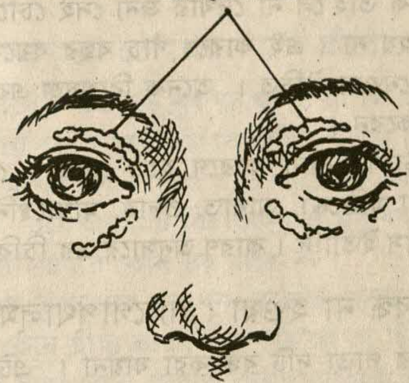
এনট্রোপিয়ন ও একট্রোপিয়ন (Entropion & Ectropion)

অনেক সময় চোখের পাতা ভেতরের দিকে (এনট্রোপিয়ন) বা বাইরের দিকে (একট্রোপিয়ন) ঘুরে যায়। এ রকম হ'লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি অপারেশন করে এটি ঠিক করে দেবেন।

জানথেলাসমা (Xanthelasma)

সাধারণত চল্লিশের বেশি সময় হলে চোখের ওপরের ও নিচের পাতায়

নাকের দিকে হলদেটে সাদা দাগের মত দেখা যায় (৪ নং ছবি)।



৪ নং ছবি

এগুলি চামড়া থেকে সামান্য উঁচু হয়ে থাকে। চামড়ার নিচে চর্বি (কোলেস্ট্রেরল) জমে গিয়ে এটা হয়। অনেক সময় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে ও সেক্ষেত্রে রক্তচাপও বেশি থাকতে পারে। আবার কোন আপাত কারণ ছাড়াও হতে পারে। জানথেলাসমা চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় তবে দৃষ্টিকটু নিশ্চয়ই। সৌন্দর্যসচেতন ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলাদের এটি মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি ওষুধ লাগিয়ে (ট্রাইক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড অথবা কারবন-ডাই-অক্সাইড স্নো) বা অপারেশন করে এগুলি তুলে দেবেন। তবে আবার হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

টোসিস (Ptosis)

চোখ খোলা থাকা অবস্থায় ওপরের পাতার প্রান্তভাগটি একটি বিশেষ উচ্চতায় থাকে যাতে চোখের পিউপিল বা তারারন্ধ্র ঢাকা না পড়ে যায় কারণ পিউপিল ঢাকা পড়ে গেলে ত কিছুই দেখা যাবে না। টোসিস হ'লে চোখের ওপরের পাতাটি নিচে নেমে আসে ও চোখ পুরো খোলা যায়না। টোসিসের মাত্রা অনুসারে চোখ অংশত বা পুরো ঢাকা পড়ে যায়।

টোসিস দু রকমের হয় – জন্মগত ও বেশি বয়সের। জন্মগত টোসিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক চোখে হয়। দু চোখে হ'লে বাচ্চাটি সবসময়

চিবুক ওপরের দিকে তুলে ধরে দেখতে চেষ্টা করে। জোর করে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করার ফলে কপাল কুঁচকে থাকে। যদি পুরো চোখটি ঢেকে থাকে তাহ'লে না দেখার জন্য সেই চোখের দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিক উন্মেষ হয় না। এই কারণে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই এর অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত। অনেক বিশেষজ্ঞ এক বছর বয়সের মধ্যেই অপারেশন করেন।

বেশি বয়সের টোসিস নানা কারণে হতে পারে। যেমন টিউমার (চোখের পাতায় বা মস্তিষ্কে), আঘাত, প্রদাহ, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস বা ডায়াবিটিস মেলিটাস ইত্যাদি। কারণ অনুসারে এর চিকিৎসা হয়।

চোখের পাতা বন্ধ না হওয়া (ল্যাগোপ্থাল্মম্)

অনেক সময় চোখের পাতা দুটি বন্ধ করা যায়না। এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফেসিয়াল নার্ভ-এর প্যারালিসিস্-এর জন্য হয়। ফেসিয়াল নার্ভ চোখের পাতার ও মুখের কিছু পেশীর নিয়ন্ত্রণ করে। মুখের দুপাশের জন্য দুটি ফেসিয়াল নার্ভ থাকে। তাই একটি ফেসিয়াল নার্ভের যদি প্যারালিসিস হয় তাহলে সে পাশের চোখের পাতা বন্ধ করা যায় না ও মুখের সে দিকের পেশীগুলিও অকেজো হ'য়ে যায়। ফলে মুখের একপাশ বেঁকে যায় ও খাবার সময় মুখের পক্ষাঘাতগ্রস্ত দিকটিতে খাবার জমে যায়।

চোখের পাতা বন্ধ না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচের পাতা বাইরের দিকে ঝুলে যায় (ectropion) ও চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। চোখ ঠিকমত বন্ধ করা যায়না (ল্যাগোপ্থাল্মস্) – চোখ বন্ধ করতে গেলে অক্ষিগোলকটি শুধু ওপর দিকে ঘুরে যায়। দিনের বেলা ও বিশেষ করে রাত্রে ঘুমনোর সময় চোখ আধখোলা থাকার জন্য কর্নিয়ার সবটা ঢাকা পড়েনা ও এর ফলে কর্নিয়া ক্রমশ শুকিয়ে যায় ও প্রদাহ হ'য় – একে এক্সপোজার কেরাটাইটিস বলে। এর ফলে কর্নিয়া ক্রমশ তার স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে।

এক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন করে চোখের পাতা দুটি পরস্পরের সঙ্গে অংশত জুড়ে দেওয়া হয় যাতে কর্নিয়া চোখের পাতায় ঢাকা থাকে। একে টারসোরাফি (Tarsorraphy) অপারেশন বলে। ফেসিয়াল নার্ভ স্বাভাবিক হয়ে এলে আবার পাতা দুটি খুলে দেওয়া হয়। এধরনের ফেসিয়াল প্যারালিসিস মস্তিষ্কে টিউমার বা রক্তক্ষরণ থেকে বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেও হতে পারে।

অপারেশন না করা পর্য্যন্ত কর্নিয়াকে আর্দ্র রাখার জন্য ময়সল জাতীয় নকল অশ্রু ঘন ঘন লাগান দরকার।

ব্লেফেরোস্পাজম্ বা চোখের পাতা কাঁপা

অনেক সময় চোখের পাতাদুটি খুব ঘন ঘন ও আপনা আপনি পড়তে থাকে ও এর সঙ্গে তাল রেখে মুখের মাংসপেশীও কুঁচকে যেতে থাকে। এটা এক চোখে ও মুখের এক পাশেও হতে পারে। এর ঠিকমত চিকিৎসা করা মুশকিল। তবে অবস্থাটি বিরক্তিকর ও অসুবিধা জনক হ'লেও এর থেকে চোখ নষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

অনেক সময় বাচ্চাদের ঘন ঘন চোখের পাতা পড়া আরম্ভ হয়। বিশেষজ্ঞ যদি কোন গ্রাহ্য কারণ পান তাহ'লে তা চিকিৎসায় ভাল হ'য়ে যাবে। অনেক সময় কোন আপাত কারণ ব্যতিরেকেই এটা হ'তে পারে ও সেক্ষেত্রে আপনা আপনি সেরে যায়। তবে অভিভাবকরা যেন বাচ্চার সামনে এ নিয়ে কোন উদ্বেগ না দেখান বা আলোচনা না করেন।

চোখের পাতার আরও নানা অসুখ আছে যার সবকটির আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চোখের পাতায় ক্যান্সারও হতে পারে। তবে সময় মত চিকিৎসা হ'লে তা সেরে যায়। চোখের পাতায় কোন গোটা বা আঁচিল যদি বড় হতে থাকে, চুলকায় ও তার থেকে রস পড়া আরম্ভ হয় – তাহ'লে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

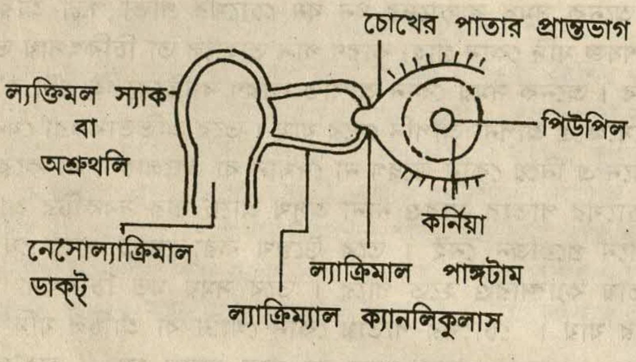
চোখ থেকে জল পড়া

চোখ থেকে জল পড়ে নানা কারণে। আবেগে – যেমন দুঃখে বা অতি আনন্দে (আনন্দাশ্রু), চোখে ধুলো-বালি পড়লে বা প্রদাহ হলে। এগুলি ছাড়া চোখে জল পড়ার আর একটি বড় কারণ নেসোল্যাক্রিমাল প্যাসেজ বা চোখের জল নিকাশী রাস্তায় (নেত্র নালি) কোন বাধার সৃষ্টি হওয়া।

আমাদের চোখের জল কতগুলি গ্রন্থির ক্ষারিত রসের সমষ্টি। এই জল সব সময়ই তৈরি হচ্ছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে নেসোল্যাক্রিমাল প্যাসেজ দিয়ে।

নেসোল্যাক্রিম্যাল প্যাসেজ

আমাদের চোখের ওপরের ও নিচের পাতায় নাকের দিকে একটি করে ছিদ্র আছে এদের বলা হয় ল্যাক্রিমালপাংটাম্ (৫ নং ছবি)। এই পাংটাম্ থেকে বেরিয়ে চামড়ার নীচ দিয়ে গিয়েছে ওপরে ও নিচে একটি করে সরু নালি – এদের বলা হয় ল্যাক্রিমাল ক্যানালি কিউলাস।



৫ নং ছবি

এই ক্যানাকিউলাস দুটি মিশেছে ল্যাক্রিমাল স্যাকে বা অশ্রু থলিতে। এই থলিটি থাকে নাকের গোড়ার পাশের (চোখের) দিকে চামড়ার নিচে। স্যাকের তলা থেকে বেরিয়েছে আর একটি নালি – নেসোল্যাক্রিমাল ডাক্ট্ (Nasolachrimal duct)। এই ডাক্ট্টির খোলা মুখটি রয়েছে নাসিকা গহ্বরে। চোখের পাতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশীর ক্রিয়ায় চোখের জল নাকের দিকে প্রবাহিত হয়। চোখের জল এর পর প্রথমে ল্যাক্রিমাল পাংটাম্ দিয়ে ঢুকে ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকুলাসে আসে। ক্যানালিকুলাস থেকে জল গিয়ে পড়ে ল্যাক্রিমাল স্যাকে আর তারপর নেসোল্যাক্রিমাল ডাক্ট্ দিয়ে নাসিকা গহ্বরে। জল যাবার এই রাস্তায় কোন বাধার সৃষ্টি হলে জল নাসিকা গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা, ফলে জল চোখ থেকে উপছে পড়ে ও গাল দিয়ে গড়িয়ে যায়।

ল্যাক্রিমাল স্যাকের প্রদাহ (Dacryocystitis)

ল্যাক্রিমাল প্যাসেজে বাধা সৃষ্টির একটি বড় কারণ ল্যাক্রিমাল স্যাকের প্রদাহ বা ড্যাক্রিওসিস্টাইটিস। এই প্রদাহ তীব্র আকারে (Acute) অথবা অল্প মাত্রায় দীর্ঘ মেয়াদী (Chronic) হ'তে পারে। অনেক সময় প্রদাহ তীব্র আকারে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ মেয়াদী রূপ নেয়। এটি যখন তীব্র আকারে হয় তখন নাকের পাশে জলের থলির জায়গাটি ফুলে ওঠে। চারপাশের চামড়া লাল হয়ে ওঠে, জলে পড়ে ও খুব ব্যথা হয়। জ্বরও হতে পারে। অনেক সময় স্যাকের ওপরের চামড়া ফুটো হয়ে গিয়ে পুঁজ বেরিয়ে আসে ও প্রদাহ কমে গেলেও ঐ ফুটোটি একটি বিকল্প রাস্তা হিসাবে থেকে যায় ও এর থেকে জল বা পুঁজ বেরোতে থাকে। একে ল্যাক্রিমাল ফিস্টুলা (Lachrimal fistula) বলে। প্রায় ক্ষেত্রে সংক্রমণ আসে কন্‌জাংক্টাইভা বা নাক থেকে। তবে এটি সাধারণত একসঙ্গে দুচোখে হয়না।

ড্যাক্রিওসিসটাইটিস হলে চোখ সব সময়েই পরিষ্কার রাখতে হবে। দিনে তিন-চার বার ইষদুষ্ণ নুন জল (এক গ্লাস জলে এক চিমটি নুন) দিয়ে চোখ ধুতে হবে। স্যাকের জায়গাটির ওপর তুলো গরম জলে ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে সেঁক দিতে হবে দিনে তিন-চার বার। রুমাল, কাপড়ের খুঁট বা গামছা ইত্যাদি থেকে চোখকে দূরে রাখতে হবে। খানিকটা তুলো সঙ্গে রাখতে হবে ও চোখ মোছার সময় এক টুকরো তুলো ছিঁড়ে নিয়ে চোখ মুছে সেটি ফেলে দিতে হবে। যাঁরা গ্রামে থাকেন তাঁরা পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করবেন না। কুয়োতে বা টিউবওয়েলের জলে করতে পারেন। এছাড়া বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম বা ড্রপ ও ক্ষেত্র বিশেষে অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপ্‌সুল বা ইনজেক্‌সেন্‌ নিতে হতে পারে।

ওষুধ লাগিয়ে ও ক্যাপসুল বা ইন্‌জেকসান ব্যবহার করে রোগের তীব্রতা কমে গেলেও অনেক সময় ল্যাক্রিম্যাল প্যাসেজে বাধার সৃষ্টি হয় ও অল্প মাত্রায় সংক্রমণ থেকে যায়। তখন যদিও ব্যথা থাকেনা, তবুও চোখ দিয়ে জল পড়তেই থাকে। অনেক সময় স্যাকের জায়গাটি গোল হয়ে ফুলে থাকে। স্যাকের ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ল্যাক্রিমাল পাংটাম দিয়ে ঘন বা পাতলা পুঁজ বেরিয়ে আসে। এর অর্থ সংক্রমণের ফলে ল্যাক্রিমাল প্যাসেজে কোথাও বাধার সৃষ্টি হয়েছে ও জল জমে থাকার জন্য সংক্রমণ থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক

ড্রপ বা মলম ব্যবহার করার উপদেশ দেন । ড্রপ বা মলম চোখে দেবার আগে স্যাকের জায়গাটি আঙুল দিয়ে খানিকটা জোরে মাসাজ করতে হবে ও জল বা পুঁজ যা বেরিয়ে আসবে তা পরিষ্কার তুলো দিয়ে মুছে নিতে হবে । আগেই বলা হয়েছে একটি তুলোর টুকরো একবারই ব্যবহার করা যাবে । কিন্তু এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল পড়া বন্ধ হয়না ও অপারেশনের প্রয়োজন হয় । বিশেষজ্ঞেরা প্রথমে সিরিঞ্জিং (Syringing) নামক পদ্ধতির সাহায্যে নেন । এতে একটি সিরিঞ্জে অ্যান্টি-বায়োটিক দ্রবণ বা নুনজল নিয়ে একটি বিশেষ ধরনের সূঁচ দিয়ে ল্যাক্রিমাল পাংটাম দিয়ে উচ্চ চাপে দ্রবণটি ল্যাক্রিম্যাল প্যাসেজে চালনা করা হয় । এর থেকে কোথায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা বোঝা যায় ও প্যাসেজটি পরিষ্কারও করা হয়ে যায় । অনেক সময় হাল্কা বাধা থাকলে তা এতে খুলেও যায় । এতে প্যাসেজটি না খুললে প্রোবিং বা ড্যাক্রিওসিস্টেকটমি বা ড্যাক্রোসিসটোরাইনোস্টমি অপারেশন করা হয় ।

জন্ম থেকেই জল পড়া

শিশুর ভ্রূণাবস্থায় নেসোল্যাক্রিমাল প্যাসেজটি বন্ধ থাকে । জন্মাবার পর এটি খুলে যায় । কিন্তু কোন কোন সময় এটি খোলেনা ও সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে । এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই । অনেক সময় এটা খুলতে সময় নেয় কয়েক মাস । তাই বিশেষজ্ঞের অনুমতি নিয়ে এ সময়টা অপেক্ষা করা যেতে পারে । তবে চোখকে সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত ওষুধ লাগাতে হবে ও স্যাকের জায়গাটি দিনে দু-তিনবার মাসাজ করতে হবে । নেসোল্যাক্রিমাল প্যাসেজ যদি নেহাত না খোলে তাহলে বিশেষজ্ঞ একটি ছোট অপারেশন করে চোখে জল যাবার রাস্তাটি খুলে দেবেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কন্‌জাংক্‌টাইভা (Conjunctiva)

কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস (Conjunctivitis)

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে জেনেছি যে, কন্‌জাংক্‌টাইভা একটি পাতলা পর্দার মত যা চোখের পাতার ভেতরের দিক ও স্ক্লেরার যে অংশটুকু

বাইরে থেকে দেখা যায় সেটিকে ঢেকে রাখে। কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস এই কন্‌জাংক্‌টাইভার প্রদাহ।

কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস নানা কারণে হ'তে পারে। এর মধ্যে ব্যাক্‌টেরিয়া ও ভাইরাস ঘটিত কন্‌জাংক্‌টিভাইটিসই বেশি হয়। এছাড়া চোখে কোন রাসায়নিক পদার্থ গেলে (যেমন অ্যাসিড, আবীর, সাবান ইত্যাদি) চোখ লাল হয় – একে বলে কেমিক্যাল কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস। চোখে কোন তীব্র আলো লাগলে (যেমন আলট্রাভায়োলেট রশ্মি) বা ধুলো-বালি গেলেও চোখ লাল হয়।

ব্যাক্‌টেরিয়া ও ভাইরাস ঘটিত কন্‌জাংক্‌টিভাইটিসের সঙ্গে পরিচয় 'জয়-বাংলা'-র দৌলতে অনেকেরই আছে। এতে চোখ লাল হয়, চোখের পাতা অনেক সময় ফুলে যায়, চোখ করকর করে – মনে হয় চোখের মধ্যে যেন বালি পড়েছে। চোখ দিয়ে জল পড়ে পিচুটি হয়, পিচুটির জন্য চোখের পাতা আটকে যায়। ভাইরাসঘটিত কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস হলে কন্‌জাক্‌টাইভার নিচে রক্তক্ষরণ হতে পারে ও চোখের জলের সঙ্গে রক্ত মিশে থাকতে পারে। শুধু ভাইরাসঘটিত কনজাংকটিভাইটিস হলে জল পড়ে বেশি, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত কন্‌জাংক্‌টিভাইটিসের পিচুটি হয় বেশি, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাস ও ব্যাক্‌টেরিয়ার মিশ্র সংক্রমণ ঘটে থাকে। কর্নিয়াতে সংক্রমণ না ছড়ালে শুধু কন্‌জাংক্‌টি-ভাইটিসে দৃষ্টি-শক্তি কমে যায়না। তবে পিচুটি ও জলের জন্য মাঝে মাঝে ঝাপসা ভাব আসতে পারে। অনেক সময় কর্নিয়াতে পিচুটি লেগে থাকার জন্য আলোর চারপাশে রামধনুর মতো দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্লকোমাতেও এ ধরনের রামধনু দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে এই রামধনু দেখার গুরুত্ব অনেক বেশি।

কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস হলে রুমাল, কাপড় বা গামছা দিয়ে চোখ মুছবেন না। সঙ্গে খানিকটা তুলো রাখবেন ও তার থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে একটি চোখ মুছে সেটি ফেলে দেবেন। এই তুলোর টুকরোটি একবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না ও এগুলি রোজ গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ দিনে দু-তিন বার ধুতে হবে। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে টেরামাইসিন, নিওস্পোরিন, সোফ্রামাইসিন, জেন্টিসিন, ক্লোরোকল জাতীয় প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম চোখে তিন-চার বার লাগাতে হবে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

ট্রাকোমা (Trachoma)

ট্রাকোমাও এক ধরনের চোখের সংক্রমণ তবে এর চোখের ক্ষতি করার ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি এত বেশি যে এ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যত অন্ধ লোক আছেন তার মধ্যে ট্রাকোমার কারণে অন্ধের সংখ্যাই বেশি। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে 50 কোটি লোক এর শিকার ও এর মধ্যে অন্তত 20 লক্ষ লোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন। আংশিক অন্ধত্বের সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি।

এই রোগটি সাধারণত অনুন্নত দেশেই বেশি হয় (বিশেষ করে সে সব দেশের গ্রামাঞ্চলে)। যেমন, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, ভারতীয় উপ-মহাদেশ ও দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া। ইয়োরোপেও আগে ট্রাকোমার প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি কিন্তু শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জন-সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর আর বিশেষ হয়না। কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি সেখানকার জীবনযাত্রার মানকে অনেক উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত করেছে। দারিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই এ রোগকে ছড়াতে সাহায্য করে। আমাদের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশে প্রায়ই অল্প জায়গার মধ্যে অনেক লোক গাদাগাদি করে বাস করেন, পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা থাকে না আর খাদ্যাভাব ত আছেই। পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার জন্য অনেক সময় দরিদ্র পিতা-মাতা পরিবার পরিকল্পনা করতে চাননা কারণ তাঁদের কাছে একটি শিশু মানে ভবিষ্যতে একজোড়া কাজের হাত। বাড়িতে শিশুর সংখ্যা থাকে বেশি ও তারা বাড়ির ভেতরে বা বাড়ির চারপাশে পায়খানা করে। এতে মাছির সংখ্যা বেড়ে যায় ও মাছি একজন আক্রান্ত শিশুর চোখের চার-পাশে বা মুখে বসার পর অন্য একটি শিশুর চোখে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে একটি পরিবারে একজন শিশু আক্রান্ত হওয়ার পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই অন্য একটি শিশুর চোখে সংক্রমণ ছড়িয়ে গেছে। এছাড়া আঙুল, গামছা, জামা- কাপড় ও দূষিত জলের মাধ্যমেও এ রোগ ছড়ায়।

ট্রাকোমা হয় ক্লামিডিয়া ট্রাকোমাটিস নামের এক ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ থেকে। যদি চিকিৎসা ঠিক মত না হয় তাহ'লে তার ফল হয় ভয়ংকর। চোখের পাতা কুঁকড়ে গিয়ে ভেতরের দিকে ঘুরে যায়, (এনট্রোপিয়ন) ও আইল্যাসগুলি কর্নিয়ার ওপর ঘষতে থাকে। ক্রমে

কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায় যার পরিণতি অন্ধত্ব পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ প্রথম থেকেই যদি চিকিৎসা করানো হয় ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয় তাহ'লে দৃষ্টি অবশ্যই রক্ষা করা যায়। টেট্রাসাইক্লিন, সালফোনামাইড, এরিথ্রোমাইসিন ও অধুনা রিফামপিসিন ট্রাকোমার পক্ষে খুব কার্যকরী ওষুধ।

অপথালমিয়া নিওনেটোরাম (Ophthalmia neonatorum)

এটি সদ্যজাত শিশুর কন্জাংক্টিভাইটিস্ যা জন্মাবার দশ দিনের মধ্যে দেখা যায়। গনোরিয়া ও অন্যান্য ধরনের সংক্রমণ থেকে এটা হয়। প্রসবের সময় মাতৃযোনীতে সংক্রমণ থাকলে তা শিশুর চোখে আসতে পারে।

অপথালমিয়া নিওনেটোরামের চিকিৎসা ঠিক সময় মতো না হ'লে চোখের খুব ক্ষতি হয়ে যায়। কর্নিয়ার আলসার থেকে কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর জন্য পরে কর্নিয়াল গ্রাফটিং-এর প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও কর্নিয়া ফুটো হয়ে গিয়ে সংক্রমণ চোখের ভেতর চলে গিয়ে গোটা চোখটাই বরাবরের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

আজকাল অবশ্য প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এ রোগ প্রায় হয় না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যেখানে এখনও বাড়িতে প্রসব হয় সেখানে এ রোগ বহু ক্ষেত্রেই হয়। শিশু জন্মাবার পর থেকে চোখে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ বা মলম দেওয়া উচিত ও সামান্য লাল হ'লে,পিচুটি দেখা গেলে জল পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অ্যালার্জিজনিত কন্জাংক্টিভাইটিস (Allergic Conjunctivitis)

অ্যালার্জি কথাটার সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচয় আছে। আমাদের শরীর সব সময় সব কিছু সহ্য করতে পারেনা। সেই সব জিনিস শরীরের সংস্পর্শে এলে বা শরীরে প্রবেশ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন বেগুন খেলে কারুর মুখ চুলকোয়, ডিম খেলে গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ বেরোয় ও চুলকোয়, নিশ্বাসের সঙ্গে ধুলো গিয়ে হাঁচি হয় বা নাক বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী অ্যালার্জি হয় – যেমন একজিমা, হাঁপানি।

কন্জাংক্টাইভায় অ্যালার্জি হলে চোখ চুলকোয়, চোখের পাতা ফুলে যায়, জল পড়ে, জ্বালা করে ও কখনও কখনও স্ক্লেরার ওপর যে

কন্‌জাংক্‌টাইভা আছে তার নিচে জলীয় পদার্থ জমে গিয়ে ফুলে ওঠে। এক ধরনের অ্যালার্জি সাধারণত গ্রীষ্মকালে দু চোখে এক সঙ্গে হয় – একে ভারনাল কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস বলে। এতে চোখের ওপরের পাতার ভেতরের পিঠে অনেক সময় গোটা গোটা মতন হয়। যারা হার্ড বা সফ্‌ট্‌ কন্‌টাক্‌ট লেন্স পরেন তাঁদেরও চোখের পাতার নিচে এধরনের গোটা হতে পারে। কন্‌জাংক্‌টাইভার অ্যালার্জি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। ধুলো, ফুলের রেণু, কসমেটিক্‌স্‌ (যেমন মাসকারা), ওষুধ (নিওমাইসিন, পেনিসিলিন, সালফা, পাইলোকারপিন, এট্রোপিন ইত্যাদি), খাদ্যবস্তু (বেগুন, চিংড়ি মাছ, ডিম, কাঁকড়া – বস্তুত যে কোন খাদ্যবস্তু এমনকি ডাল আটা দুধও), পোকার কামড়, (বিশেষ করে চোখে ঢুকে গেলে) ইত্যাদি নানা কারণে কন্‌জাংক্‌টাইভার অ্যালার্জি হতে পারে।

অ্যালার্জি হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে তবে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ফিন্টাল, ইফিরাল, আন্দ্রে আইকুল, ডেকোমিক, ফেনিল, মেজল জাতীয় ড্রপ এক ফোঁটা করে দিনে চার-পাঁচবার ব্যবহার করা যেতে পারে। কি থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে তা বার করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন ডিমে যদি সন্দেহ হয় তাহ'লে দু-তিন দিন ডিম খেয়ে ও দু-তিন দিন ডিম না খেয়ে অ্যালার্জির কোন পরিবর্তন হয় কি না তা দেখতে হবে। স্কিন টেস্ট করালে কী কী থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে তা জানা যাবে।

বাচ্চাদের চোখের অ্যালার্জি বেশি হয়, তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। মনে রাখা দরকার যে কন্‌জাংক্‌টাইভার অ্যালার্জি চোখের কোন স্থায়ী ক্ষতি করে না, যদিও চোখ লাল হয়ে ফুলে গিয়ে অনেক সময় ভয়ংকর রূপ নেয়। তাই বাচ্চার যদি অ্যালার্জিজনিত কন্‌জাংকটিভাইটিস্‌ হয় তাহ'লে বাবা-মার ভয় পাবার কিছু নেই। তবে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে রোগটি সত্যিই অ্যালার্জি জনিত কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস কিনা।

সাবকন্‌জাংক্‌টাইভালহেমোরেজ (Subconjunctival haemorrhage)

কন্‌জাংক্‌টাইভার নিচে রক্তক্ষরণকে সাবকন্‌জাংক্‌টাইভাল হেমোরেজ বলে। এ ধরনের রক্ত ক্ষরণ হয় স্ক্লেরাও ওপর যে কন্‌জাংক্‌টাইভা আছে তার নিচে। অনেক সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা যায়

চোখের সাদা অংশের ওপর একটা টক্‌টকে লাল ছোপ পড়েছে। এটা ঘুমের ঘোরে চোখে আঙুলের খোঁচা লেগে বা অন্য কোন ভাবে আঘাত লেগে হ'তে পারে। শিশুদের হুপিং কাশি হ'লে সাবকন্‌জাংক্‌টাইভাল হেমোরেজ হতে পারে। তীব্র আকারে কন্‌জাংক্‌টিভাইটিস হলেও এটা হয়। মস্তিষ্কে আঘাত লেগে বা অক্ষিকোটরের হাড় ভেঙে গেলেও সাবকন্‌জাংক্‌টাইভাল হেমোরেজ হতে পারে। শুধু সাবকন্‌জাংক্‌টাইভাল হেমোরেজ থেকে চোখের কোন স্থায়ী ক্ষতি হয়না ও দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনি এটা মিলিয়ে যায়। তবে যদি বার বার হয় তাহলে শরীরে অন্য কোন রোগ আছে কি না (যেমন উচ্চ রক্তচাপ, নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, রক্তাল্পতা, লিউকিমিয়া ইত্যাদি) সে সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কোন কোন ওষুধ থেকেও সাবকন্‌জাংক্‌টাইভাল হেমোরেজ হয়–যেমন সালফোনামাইড, গ্রন্থির ব্যাথায় ব্যবহৃত বিউটা-জোলিডিন, ক্লোরামফেনিকল, ডায়াবেটিস রোগের ব্যবহৃত টলবুটামাইড ইত্যাদি।

টেরিজিয়াম (Pterygeum)

একে বাংলায় মাসতাল বা মাসড়া ও হিন্দিতে নাখুনা বলে। এতে কন্‌জাংকটাইভার কলা কর্নিয়ার দিকে এগিয়ে যায় – এটা দেখতে ডানার মতো তাই এর নাম গ্রীক ভাষা থেকে টেরিজিয়াম (৬নং ছবি)। এর কোন



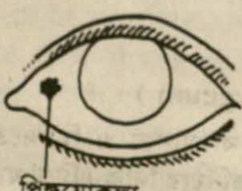
৬ নং ছবি

কোন ওষুধ নেই – অপারেশনই এক মাত্র চিকিৎসা। এই অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় না ও দু-তিন দিনের মধ্যে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশন করানোর পরও আবার টেরিজিয়াম হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এরকম হ'লে আবার অপারেশন করে টেরিজিয়াম কর্নিয়ার যে অংশটুকুর

সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাতে ল্যামেলার গ্রাফ্‌ট করাহয় । অথবা অপারেশনের পর কর্নিয়ার আক্রান্ত অংশটুকুতে কন্‌টাক্ট রেডিয়েশন দেওয়া হয় । Thiotepa (ক্যানসারে ব্যবহৃত অষুধ) ও 1:2000 মাত্রায় ড্রপ হিসাবে দেওয়া হয় ।

পিঙ্গুয়েকুলা (Pinguecula)

অনেক সময় কর্নিয়ার পাশে- সাধারণত নাকের দিকে – ছোট হলদেটে গোটার মত হয় । এটা দু-চোখে এক সঙ্গে হয় (৭ নং ছবি) । অনেকে এরকম হলে ভয় পেয়ে যান কিন্তু এতে চোখের কোন ক্ষতি হয়না । তবে দেখতে খারাপ লাগতে পারে ও সেক্ষেত্রে অপারেশন করে এটি সরিয়ে দেওয়া যায় ।



৭ নং ছবি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্নিয়া (Cornea)

আমাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখার জন্য কর্নিয়া স্বচ্ছ থাকা দরকার । ঘোলাটে কর্নিয়া দিয়ে আলো ঠিকমত চোখে প্রবেশ করতে পারে না ও দৃষ্টিশক্তি কমে যায় । আর সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ কর্নিয়া অন্ধত্ব নিয়ে আসে ।

কর্নিয়াকে সুস্থ রাখার জন্য চোখের অবিরাম প্রচেষ্টার কথা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে । কিন্তু অনেক সময় এই প্রতিরোধ ভেঙে যায়

ও কর্নিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। কর্নিয়ার এই অসুস্থতা নানা ধরনের হয় যার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে বলা হ'ল। এছাড়া জন্মগত ভাবেও কর্নিয়ার গঠনে নানা ত্রুটি থাকতে পারে।

কেরাটাইটিস (Keratitis)

কেরাটাইটিসের অর্থ কর্নিয়ার প্রদাহ। এই প্রদাহ নানা কারণে ও নানা ধরনের হতে পারে। যেমন ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে কেরাটাইটিস হয়। এই সংক্রমণজনিত কেরাটাইটিস থেকে কর্নিয়ার আলসার হ'তে পারে, যার সময়মত চিকিৎসা না হ'লে চোখের খুব ক্ষতি হ'য়ে যায়। এ ধরনের সংক্রমণে চোখ লাল হয়, ব্যথা করে, আলো সহ্য হয়না, চোখ দিয়ে জল পড়ে ও দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। সংক্রমণ কন্জাংক্টাইভাতে ছড়িয়ে গিয়ে পিচুটিও হতে পারে। কর্নিয়ার আলসার থেকে অনেক সময় কর্নিয়া ফুটো হয়ে গিয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসার অভাবে কেরাটাইটিস বা কর্নিয়ার আলসার যদি কর্নিয়ার গভীর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় তাহ'লে চিকিৎসার দ্বারা সংক্রমণ সেরে যাবার পরও কর্নিয়া অস্বচ্ছ থেকে যায় ও দৃষ্টিশক্তি ভীষণভাবে কমে যায়। তখন কর্নিয়ার গ্রাফটিং অপারেশন ছাড়া দৃষ্টি ফেরাবার আর কোন উপায় থাকেনা। সংক্রমণ ছাড়াও কেরাটাইটিস হয়, যেমন অ্যালার্জি বা অটোইমিউন রোগে। এছাড়া শরীরের অন্যান্য রোগ – যেমন সিফিলিস, চর্মরোগ, বিপাকের গোলযোগজনিত রোগ, অপুষ্টি ইত্যাদির কর্নিয়ার ওপর প্রভাব আছে।

কেরাটাইটিস বা কর্নিয়ার আলসারে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সেই মত চিকিৎসা করতে হবে।

ফরেন বডি (Foreign body)

চোখে বহিরাগত বস্তু বা ফরেন বডির অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। ট্রেনে যেতে যেতে (বিশেষ করে খালি চোখে জানলার ধারে বসলে) চোখে কয়লার টুকরো পড়তে পারে। ঝড়-বৃষ্টির সময় চোখে ধুলো-বালি ঢোকে। যাঁরা গ্রাইন্ডিং বা গ্যাস কাটিং করেন (প্রতিরোধক চশমা না পরে) তাঁদের চোখেও ফরেন বডি যেতে পারে। আবার ছেনিহাতুড়ি নিয়ে কাজ করার সময় (যেমন চিপিং করা) হাতুড়ির একটি ক্ষুদ্র অংশ হাতুড়ি থেকে ভেঙে গিয়ে তীব্র বেগে চোখে ঢুকে

চোখের একেবারে ভেতরে চলে যেতে পারে (ইন্ট্রাঅকুলার ফরেন বডি)।

চোখে ফরেন বডি পড়লে চোখ কখনই রগড়ান উচিত নয় – এতে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যদি মনে হয় চোখে কিছু ঢুকেছে তাহ'লে চোখ বড় করে খুলে বারবার জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুতে হবে। চোখে যদি ফরেন বডি আলগাভাবে থাকে তাহলে প্রায় ক্ষেত্রে এতেই ফরেন বডি চোখ থেকে বেরিয়ে যাবে। তবে ফরেন বডি যদি কর্নিয়াতে গেঁথে থাকে তাহ'লে তা এভাবে বেরোবে না। তাই সবসময় বিশেষজ্ঞের কাছে দেখিয়ে নিতে হবে যে চোখে কোন ফরেন বডি আছে কিনা বা চোখের অন্য কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ির কেউ বা কোন সহকর্মীর দ্বারা কাপড়ের খুঁট বা দেশলাই কাঠি ইত্যাদি দিয়ে ফরেন বডি বার করবার চেষ্টা করবেন না। এর ফল খুব মারাত্মক হতে পারে।

কেমিক্যাল বার্ন (Chemical Burn)

অ্যাসিড বা অ্যালকালি জাতীয় পদার্থ চোখের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। ফেনল, সিমেন্ট, কস্টিক সোডা ইত্যাদি অনেক কিছুই চোখের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। এর মধ্যে অ্যালকালি জাতীয় পদার্থগুলি (যেমন সিমেন্ট, চুন, কসটিক সোডা) বেশি ক্ষতি করে। যদি এধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে চোখ জল দিয়ে খুব ভালো ভাবে ধুতে হবে – এটাই চিকিৎসার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটা বড় গামলা বা বালতিতে জল নিয়ে তার মধ্যে চোখ দুটি ডুবিয়ে দিয়ে বড় করে খুলে রাখতে হবে। যদি বড় পাত্র না পাওয়া যায় তাহ'লে চোখ বড় করে খুলে বার বার জলের ঝাপটা দিয়ে ধুতে হবে। এর পর জরুরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে।

অনেক সময় গরম জল বা গরম তেলের ছিটে (যেমন মাছ ভাজার সময়) চোখে লাগে। এক্ষেত্রেও চোখ জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

জেরোপ্থালমিয়া (Xerophthalmia)

জেরোপ্থালমিয়া একটি অপুষ্টিজনিত রোগ যা শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশি হয়। ভিটামিন-এ-র অভাব এর প্রত্যক্ষ কারণ। সময় মত ব্যবস্থা না নিলে

এর পরিণতি কেরাটোম্যালেসিয়া (Keratomalacia)। কেরাটোম্যালেসিয়ায় আক্রান্ত শিশুর কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায় ও শিশু অন্ধ হয়ে যায়।

যেহেতু জেরোপ্থালমিয়া অপুষ্টিজনিত রোগ তাই স্বভাবতই এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে এর প্রকোপ বেশি। দেখা গেছে শুধুমাত্র এশিয়াতেই প্রতিবছর 50 লক্ষ শিশু এর শিকার হয় । তার মধ্যে প্রায় 2.5 লক্ষ শিশু অন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের ভাগ 30 থেকে 40 হাজার শিশু। অথচ অতি অল্প খরচে এই রোগ প্রতিহত করা যায়।

ভিটামিন A বা রেটিনল এক ধরনের কোহল। রেটিনল বেশি পরিমাণে থাকে লিভারে (বিশেষ করে মাছের লিভারে), দুধ, মাখন ও ডিমে। উদ্ভিজ খাদ্যে থাকে ক্যারোটিন। ক্যারোটিন অন্ত্রে ভিটামিন A তে রূপান্তরিত হ'য়। ক্যারোটিন বেশি থাকে সবুজ পাতাওয়ালা সবজি (যেমন শাক, বাঁধাকপি, লেটুস), গাজর, লাল কুমড়োতে। শাকের মধ্যে বেশি থাকে মূলো, সজনে, পালং, নটে ও কলমীতে। কোন কোন ফলে যেমন পাকা পেঁপে, পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন আছে। তবে উদ্ভিজ ক্যারোটিন সহজ পাচ্য নয়। তাই সব্জি রান্নার একটা নিয়ম আছে যা পরে বলা হয়েছে।

ভিটামিন A শোষিত হয় অন্ত্র থেকে। রক্তে রেটিনলের স্বাভাবিক মাত্রা প্রতি লিটারে 200 - 500 মাইক্রোগ্রাম, ক্যারোটিনের ক্ষেত্রে 200 - 1200 মাইক্রোগ্রাম। রক্তে রেটিনলের বা ক্যারোটিনের মাত্রা এর বেশি হলে বাড়তি অংশটুকু সঞ্চিত হয় লিভারে। রক্তে ভিটামিন A'র মাত্রা কম হয়ে গেলে লিভারের সঞ্চয় থেকে এটি রক্তে চলে আসে। শরীরে ভিটামিন A' র অভাব হয় বিভিন্ন কারণে :

১। খাদ্যে যদি ভিটামিন-A কম থাকে ও খাদ্য যদি সুষম না হয় তাহ'লে শরীরে ভিটামিন A কমে যায়। এক্ষেত্রে প্রথমদিকে লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন A দিয়ে শরীর তার প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় কিন্তু পরে এই সঞ্চয় কমে গেলে শরীরে ভিটামিন A'র অভাব দেখা দেয়।

২। খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন A থাকা সত্ত্বেও যদি তা শোষিত না হয় তাহ'লে রক্তে ভিটামিন A'র মাত্রা কমে যাবে। যেমন শিশুর উদরাময় হ'লে খাদ্যবস্তু খুব তাড়াতাড়ি অন্ত্র থেকে বেরিয়ে যায় ও শোষিত হবার সময় পায় না। অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব থেকেই এটা হয় – বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। শিশু অনেক সময় বাসি বা পচা খাবার খায় – মাটিতে পড়ে থাকা ভাত বা মুড়ি খুঁটে খুঁটে খায়। এর থেকে অন্ত্রে সংক্রমণ হয়ে উদরাময় হয়।

৩। শরীরে ভিটামিন A'র প্রয়োজন যদি বেড়ে যায় (যেমন হাম জ্বরে) ও খাবারে যদি বাড়তি ভিটামিন A না থাকে বা লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন A যথেষ্ট না হয়, তাহলে শরীরে ভিটামিন A'র অভাব দেখা দিতে পারে।

৪। অন্ত্র থেকে ভিটামিন A শোষিত হওয়ার জন্য ভিটামিন E,B ভিটামিন কোলিন, স্নেহ পদার্থ ও পিত্ত লবণের প্রয়োজন হয়। এগুলির অভাবে শরীরেভিটামিন A'র অভাব হয় খাদ্যে যথেষ্ট ভিটামিন A থাকা সত্ত্বেও। লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন A রক্তে আসে রেটিনল বাইণ্ডিং প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব থাকলে অর্থাৎ শিশু সাধারণ-ভাবে অপুষ্টিতে ভুগলে এই রেটিনল বাইণ্ডিং প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়না। ফলে লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন A রক্তে আসতে পারেনা। আর লিভার যদি অসুস্থ হয় তাহ'লে তা ভিটামিন A সঞ্চয় করতে পারে-না।

শরীরে ভিটামিন A'র অভাব হ'লে প্রথম যে লক্ষণটি দেখা যায় তাহ'ল রাত্রান্ধতা – চলতি ভাষায় যাকে রাতকানা বলে। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে দেখেছি যে রেটিনাতে রড ও কোন নামে দুই ধরনের গ্রাহী কোষ আছে। এর মধ্যে রড অল্প আলোতে বা রাত্রে দেখার সময় কাজ করে। রডে থাকে রডপ্সিন নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ যা আলোর প্রভাবে ভেঙে যায় ও রেটিনাতে সংবেদনের সৃষ্টি করে। এই সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছে দেখার অনুভূতি জাগায়। যতক্ষণ আমরা দেখছি, বিশেষ করে রাত্রে, ততক্ষণ অনবরত রডপ্সিন ভেঙে যাচ্ছে ও আবার তৈরি হচ্ছে। এই তৈরি হওয়ার সময় ভিটামিন A'র প্রয়োজন। তাই ভিটামিন A'র অভাব থাকলে রডপ্সিন ঠিকমত তৈরি হয়না ও অল্প আলোতে বা রাত্রে দেখতে অসুবিধা হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশু সন্ধ্যার পর আর কোথাও যেতে চায় না – ঘরের এককোণে বসে থাকে। অবশ্য শিশু হামাগুড়ি দিতে বা হাঁটতে না শিখলে মায়ের এটা নজরে পড়ে না। শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখলে মায়েদের চোখে এটা ধরা পড়ে ও এ ব্যাপারে মায়েদের পর্যবেক্ষণ সবসময় সঠিক হয়। এ অবস্থায় প্রয়োজন মত ভিটামিন A প্রয়োগ করলে শিশুর রাত্রের দৃষ্টি দু-তিন দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কিন্তু শিশুর দেহে ভিটামিন A'র অভাব যদি চলতেই থাকে তাহলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। প্রথম দিকে কন্‌জাংক্‌টাইভা ও পরে কর্নিয়া তাদের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে ও চোখে অশ্রুর ভাগ

কমে যায়। কর্নিয়ার পাশে কন্‌জাংক্‌টাইভার ওপর সাদা গোটার মত হয়। একে বিটট্‌স্‌ স্পট বলে। এর চারপাশে ফেনার মত জমে, যা ঘষলে উঠে যায়। অবশ্য এই বিটট্‌স্‌ স্পট শুধু ভিটামিন 'A'-র অভাব ছাড়াও অন্যান্য অপুষ্টিতেও হতে পারে। যা হ'ক ভিটামিন 'A'র ঘাটতি যদি পূরণ করা না হয় তাহ'লে কেরাটোম্যালেসিয়া হয়। কর্নিয়ার স্বচ্ছতা কমতে থাকে ও তা ক্রমশ পুরোপুরি অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে শিশু অন্ধ হয়ে যায়। কর্নিয়া নরম হয়ে যায় ও এই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে জীবাণুরা একে আক্রমণ করে ও কর্নিয়ার আলসার হয়। ঠিক মত চিকিৎসা না হ'লে আলসারের ও কর্নিয়ার কোষ কলার দুর্বল অবস্থার দরুন কর্নিয়া ফুটো হয়ে গিয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অথচ সময় মত সজাগ হ'লে এ ভয়ংকর পরিণতি সহজেই এড়ান যায়। বিশেষজ্ঞরা ভিটামিন A ক্যাপসুল, ড্রপ বা ইন্‌জেক্‌শান ও সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন A সম্পৃক্ত খাবার খাওয়ানোর উপদেশ দেন। এই খাবার যে সবসময় দামী হ'তে হবে তা নয়। অনেকের জানা নেই যে 68 গ্রাম পালং শাকে ভিটামিন A'র পরিমাণ 1.7 লিটার দুধ, 6 কেজি গোরুর বা পাঁঠার মাংস ও 227 গ্রাম মুরগীর ডিমের সমান।*

অনেকের ধারণা যে অত শাকপাতা বাচ্চাদের খাওয়ানো চলে না। এটা ভুল ধারণা। তবে শাক খুব মিহি করে কুচিয়ে ও অল্প থেঁতো করে নিয়ে জলে অল্প ফুটিয়ে নিয়ে জলটি ফেলে দিয়ে আবার জল দিয়ে শাক সেদ্ধ করতে হবে। এতে তার পাচ্যতা বাড়বে ও সবজির সঙ্গে কীটনাশক বা অন্যান্য দূষণীয় পদার্থ থাকলে তা বেরিয়ে যাবে। এই ভাবে তৈরি করা সবজি শিশুর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে সামান্য ভোজ্য তেল মিশিয়ে দিলে তা অন্ত্রে শোষণের সাহায্য করবে। এই তেল দিয়ে সবজি হাল্কা ভাবে ভেজে নেওয়া যেতে পারে, তবে কড়া করে ভাজলে সবজির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

কর্নিয়াল গ্রাফটিং (Corneal grafting)

কর্নিয়া একবার অস্বচ্ছ হয়ে গেলে (তা সে ভিটামিন A'র অভাবের জন্যই হোক বা কর্নিয়াল আলসার বা অ্যাসিড অ্যাল্‌কালিতে পুড়ে যাওয়ার জন্যই হোক) তাকে ওষুধ দিয়ে আর স্বচ্ছ করা যায় না। এক্ষেত্রে কর্নিয়াল গ্রাফটিং বা কেরাটোপ্লাস্টি (Keratoplasty)

Field guide to the detcrction and Controll of xeropthalmia — A. Sommer. W.H.O Publication P-43

অপারেশনের প্রয়োজন হয়। এই অপারেশনের মাধ্যমে কর্নিয়ার অস্বচ্ছ অংশটি (যা কর্নিয়ার স্থূলতার সমান বা আংশিক হ'তে পারে) তুলে ফেলে তার জায়গায় স্বচ্ছ কর্নিয়া বসিয়ে দেওয়া হয়। এই স্বচ্ছ কর্নিয়া আসে কোন দাতার চোখ থেকে তাঁর মৃত্যুর পর – যিনি জীবিতকালে তাঁর চোখ দুটি এই মহৎ উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন। দাতার মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (২-৩ ঘন্টার মধ্যে) চোখ দুটি নেওয়া হয়। তবে যদি মৃত্যুর পর চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে দিয়ে চোখের ওপর আইস ব্যাগ রেখে দেওয়া হয় তাহ'লে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। আই-ব্যাংকে অবশ্য কর্নিয়া আর্দ্রকক্ষে হিমায়িত করে 24 থেকে 48 ঘন্টা রাখা হয়। আজকাল Dimethyl sulfoxide12% দ্রবণে -৪0° সেন্টিগ্রেড তরল নাইট্রোজেনে হিমায়িত করার পর -197° সেন্টিগ্রেড তাপে (চারপাশে কিছুটা স্ক্লেরা সমেত) কর্নিয়া অনির্দিষ্ট-কালের জন্য রেখে দেওয়া যায়।

অন্ধত্ব দূরীকরণে কর্নিয়াল গ্রাফটিং অপারেশন করার পথে আমাদের দেশে প্রধান বাধা যথেষ্ট পরিমাণে দাতার অভাব। অনেকেই ধর্মীয় সংস্কারে বা সমাজসচেতনতার অভাবে চোখ দান করতে চান না। তাঁরা একবারও ভাবেন না যে তাঁদের মৃত্যুর পর চোখদুটি তাঁদের কোন কাজেই লাগবে না অথচ তা দিয়ে একজন অন্ধ লোক তাঁর দৃষ্টি ফিরে পাবেন। একজন অন্ধজনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার মত পুণ্য কাজ আর কী হ'তে পারে ? আর ভেবে দেখুন দাতার মৃত্যুর পর তাঁর শরীরের একটি অংশ অন্য একজনের চোখে জীবিত থেকে তাঁর এই মহৎ কাজের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত শুধু কর্নিয়াই পালটানো সম্ভব গোটা চোখটি পালটানো যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছানি (Cataract)

পৃথিবীতে যত অন্ধ লোক আছেন তার একটা বিরাট অংশ ছানির জন্য অন্ধ। শীতের দেশ থেকে গরমের দেশে ছানি বেশি হয় ও অপেক্ষাকৃত

কম বয়সে হয় । আমাদের দেশে পঞ্চাশ বছর বয়সে বা তার কিছু আগে ছানি পড়তে পারে, কিন্তু শীতের দেশে সাধারণত ষাট-সত্তর বছর বয়সে ছানি পড়ে । এখানে অবশ্য বার্ধক্যজনিত ছানির কথা বলা হচ্ছে – ছানি আরও নানা রকমের হয় যার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে ।

ছানি পড়লে অনেকে ভয় পেয়ে যান, কিন্তু এই ভয় অহেতুক । ছানি পড়া মানে চোখ বরাবরের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া নয় – এটা একটা সাময়িক অসুবিধা । চোখের অন্যান্য অংশগুলি ঠিক থাকলে অপারেশন করে ছানি পড়া চোখের লেন্সটি বার করে দিয়ে উপযুক্ত পাওয়ারের কৃত্রিম লেন্স ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে আনা যায় ।

ছানি কি ?

প্রথম পরিচ্ছেদে চোখের লেন্সের (ক্রিস্টালাইন লেন্স) কথা বলা হয়েছে । আলোক রশ্মিকে প্রতিসৃত করে রেটিনাতে তাদের ফোকাস বিন্দু ফেলতে ও অ্যাকোমডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন দূরত্বের দৃশ্য বস্তুকে দেখতে লেন্স সাহায্য করে – তাই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই । এর জন্য অবশ্য লেন্স সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন । তা না হলে আলো এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না ও দৃশ্যবস্তু অস্পষ্ট হয়ে যাবে । লেন্স যখন তার স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে তখন লেন্সের সেই অবস্থাকে ছানি পড়া বলে ।

ছানির প্রকারভেদ

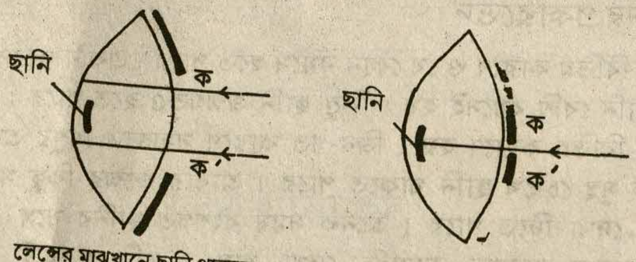
ছানি বিভিন্ন কারণে ও যে কোন বয়সে হতে পারে । একটা ধারণা আছে যে ছানি বেশি বয়সেই হয় । কিন্তু ছানি জন্মগতও হতে পারে । জন্মগত ছানি বিভিন্ন কারণে হয় । জিন-গত কারণে সদ্যজাত শিশুর অন্য দিক থেকে সুস্থ চোখে ছানি থাকতে পারে । আবার জন্মের কিছু সময় পর ছানি দেখা দিতে পারে । অনেক সময় বংশগত ছানির সঙ্গে চোখের বা দেহের অন্যান্য অসঙ্গতি দেখা যায় । যদি গর্ভবতী মায়ের গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে রুবেলা বা জার্মান মিজ্‌ল্‌স্ (Rubella - German Measles) হয় তাহলে শিশু ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে । ছানির সঙ্গে সঙ্গে চোখ কাঁপা (Nystagmus) অস্বাভাবিক ছোট চোখ (Microphthalmos), গ্লকোমা, বধিরতা ও হার্টের অসুখ

ইত্যাদি থাকতে পারে। এছাড়া গর্ভবতী মায়ের মাম্পস্ (Mumps) বসন্ত, পোলিও বা সিফিলিসের সংক্রমণ থাকলে শিশুর ছানি হতে পারে। আবার শিশু গর্ভে থাকার সময় মা যদি সুষম খাদ্য না পান অর্থাৎ অপুষ্টিতে ভোগেন তাহলেও গর্ভস্থ শিশুর ছানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বার্ধক্যের ছানি (Senile Cataract)

সাধারণত পঞ্চাশ বছর বয়সের পর হয় তবে এর অনেক আগে বা পরে হতে পারে। এ ধরনের ছানি আস্তে আস্তে বাড়ে ও ছানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তি কমে আসতে পারে। অনেক সময় এক চোখ দিয়েই একটা জিনিস দুটো বা তার বেশি দেখায় - চাঁদের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি চাঁদ দিয়ে যেন মালা গাঁথা হয়েছে (বহুদৃষ্টি – Polyopia)। অনেকে আবার চোখের সামনে কাল দাগের মত দেখেন – যা চোখ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। চোখ স্থির রাখলে দাগটিও স্থির থাকে (ভিট্রেয়াস ওপাসিটির সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়)। এ ধরনের ছানি যদি লেন্সের মাঝামাঝি জায়গায় হয় (Central Cataract) তাহ'লে দেখার অসুবিধা অনেক আগেই আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে আলো যত জোরাল হয় দৃষ্টি ততই ঝাপসা হয়ে যায় – দুপুরের থেকে ভোর বা সন্ধ্যেবেলায় বেশি দেখা যায়। এর কারণ ভোর বা সন্ধ্যেবেলার কম আলোতে পিউপিল বা তারারন্ধ্র অপেক্ষাকৃত বড় থাকে ও আলোকরশ্মি ছানির পাশ কাটিয়ে রেটিনাতে পৌঁছতে পারে (৮ নং ছবি)। জোরাল আলোয়

কর্ক-পিউপিল

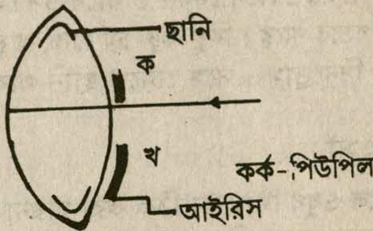


লেন্সের মাঝখানে ছানি থাকলে কম আলোতে পিউপিল বড় হয়ে যাওয়ার জন্য আলো ছানির পাশ কাটিয়ে রেটিনাতে পৌঁছে যায়।

লেন্সের মাঝখানে ছানি থাকলে জোরালো আলেতে পিউপিল ছোট হয়ে যাওয়ার জন্য ছানিতে আটকে যায়।

৮ নং ছবি

পিউপিল ছোট হয়ে, যায় ফলে চোখে আপতিত আলোকরশ্মি ছানিতে আটকে যায়। অথচ এই ছানি যদি লেন্সের কিনারায় থাকে (Peripheral cataract) তাহ'লে প্রথম দিকে দেখার কোন অসুবিধা হয়না – জোরাল আলোয় দেখতে বেশি সুবিধা হয়। (৯ নং ছবি) বার্ধক্যজনিত ছানি আস্তে



ছানি লেন্সের কিনারায় থাকলে আলোর রেটিনাতে পৌছাতে অসুবিধা হয় না- জোরাল আলোয় পিউপিল ছোট হলেও।

৯ নং ছবি

আস্তে বাড়ে ও তার সঙ্গে তাল রেখে দৃষ্টিশক্তিও কমতে থাকে। ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন দৈনন্দিন কাজকর্ম করা মুশকিল হয়ে পড়ে আর তখনই অপারেশনের প্রশ্ন আসে। তবে সবার ক্ষেত্রে একই গতিতে ছানি বাড়েনা। তাই কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর ছানির অপারেশন কবে হ'বে তাহ'লে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়না।

জন্মগত ও বার্ধক্য জনিত ছানি ছাড়া আরও নানা অবস্থায় ছানি হতে পারে। যেমন চোখে আঘাত লাগলে বা চোখের ভিতরে প্রদাহ হলে। আবার কতকগুলি ওষুধ যেমন পাইলোকাপ্রিন (ড্রপ আকারে গ্লকোমায় ব্যবহৃত), করটিকোস্টেরয়েড, ক্লোর প্রমাজিন, ট্রিপটানল ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে ছানি হতে পারে। নানা ধরনের বিকিরণও ছানির কারণ হতে পারে। সূর্যের আলোয় যে অতি বেগুনী অংশ আছে তা ছানির কারণ হিসাবে স্বীকৃত। ইঁদুর, খরগোশ, বাঁদর ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 300 নানোমিটারের বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ছানি হতে পারে। এই কারণে যে সব অঞ্চলে সূর্য কিরণের মাত্রা ও সময়কাল বেশি যেমন–ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, আফ্রিকার ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু কিছু অংশে শীত প্রধান দেশ থেকে ছানি বেশি হয়।

তবে ছানি পড়ার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাব পড়া দরকার। কারণ অতি বেগুনী রশ্মি অতি সামান্য অংশই ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয়, এর অধিকাংশ অংশই ওজন স্তরে আটকে যায়। এছাড়া অবলোহিত রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ ও রঞ্জন রশ্মিও ছানির কারণ হতে পারে।

কয়েকটি বিপাকিয় রোগে যেমন ডায়াবেটিস মেলিটাস, গ্যালাক্টোসোমিয়াতেও ছানি পড়তে পারে। কিছু কিছু চর্ম রোগ, স্নায়ুরোগ, জীনগত রোগের (যেমন ডাউন্স্ সিন্ড্রোম) সঙ্গে চোখে ছানি থাকতে পারে।

ছানির চিকিৎসা

চোখে ছানি পড়লে ওষুধ দিয়ে তা ঠিক করা যায়না। ছানির ওষুধ বলে বাজারে অনেক ড্রপ আছে কিন্তু তার কোনটাই পরীক্ষিত ওষুধ নয়। ছানির একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন।

জন্মগত ছানির ক্ষেত্রে অপারেশন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার। এ সম্বন্ধে শিশুর অভিভাবকদের সক্রিয় হতে হবে। শিশুর একমাস বয়সের মধ্যে অপারেশন করিয়ে চোখে উপযুক্ত পাওয়ারের **এক্স্টেনডেড ওয়ার কন্টাক্ট্ লেন্স** (Extended Wear Contact Lens) পরিয়ে রাখা উচিত তা না হ'লে শিশুর দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হবে না, অ্যামব্লাইওপিয়া হয়ে যাবে। এরকম হয়ে গেলে শিশুর ঐ চোখের দৃষ্টি কখনই স্বাভাবিক হবে না।

বার্ধক্যজনিত ছানিতে প্রথম অবস্থায় চশমা দিয়ে দৃষ্টির উন্নতি সাধন করা যেতে পারে। সাধারণত মাইনাস পাওয়ারের লেন্স লাগে, কারণ ছানি পড়ার দরুন চোখের লেন্সের প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index) বেড়ে যায় ও ক্ষীণদৃষ্টি হয়। এই কারণে যাঁদের হয়ত প্লাস পাওয়ারের চশমা পরে পড়াশোনা করতে হতো ছানি পড়ার পর তাঁরা বিনা চশমায় পড়তে পারেন কারণ তাদের আগের প্লাস পাওয়ার ও ছানি পড়ার দরুন মাইনাস পাওয়ারে কাটা-কাটি হয়ে যায়। তাঁরা ভাবেন তাদের চালশে কেটে গেছে ও চোখ ভালো হয়ে গেছে। অবশ্য চশমা দিয়ে দৃষ্টির উন্নতি ছানির কিছুটা স্তর পর্যন্ত করা যায় কিন্তু কিছু সময় পর চশমায় আর কোন কাজ হয়না। এর পর অপারেশনের প্রশ্ন আসে।

আজকাল অপারেশনের জন্য ছানি পুরো পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়না ও ছানিগ্রস্ত লেন্সের জায়গায় একটি নকল লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। একে

ইনট্রাঅকুলার লেন্স (Intercular lens বা সংক্ষেপে IOL) বলা হয়। ইনট্রাঅকুলার লেন্স দিলে অপারেশনের পর মোটা কাঁচের চশমা পরতে হয়না। অনেক সময় চশমা ছাড়াই স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি পাওয়া যায়। অবশ্য পড়াশোনা করার জন্য চশমা পরতে হয়। সম্প্রতি বাইফোকাল বা মাল্টিফোকাল IOL-এর প্রচলন হচ্ছে। যদি ইনট্রাঅকুলার লেন্স না দেওয়া হয় তাহ'লে অপারেশনের পর বেশি পাওয়ারের প্লাস লেন্সের (+ 10.00 Dsp বা তার কাছাকাছি) চশমা পরতে হয়। এই ধরনের মোটা লেন্সের কতগুলি অসুবিধা আছে। লেন্সটি চোখে স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে চশমার ফ্রেমে অনেকটা সামনে থাকার জন্য দৃশ্য বস্তু প্রায় শতকরা 33 ভাগ বিবর্ধিত দেখায়। এতে দূরের জিনিস খানিকটা সামনে এগিয়ে এসেছে বলে ভ্রম হয়। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিচের ধাপটি তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে উপরে আছে মনে হয় ও তাই একটু উপর থেকে শরীরের ভর ছেড়ে দেবার জন্য পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। টেবিলে চা-য়ের কাপ রাখার সময় একটু উপর থেকে কাপটিকে ছেড়ে দিয়ে অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। চোখের সঙ্গে হাতের ও পায়ের নতুন করে সমঝোতা হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এছাড়া লেন্সের কেন্দ্র দিয়ে না দেখে কিনারা দিয়ে দেখলে দৃশ্য বস্তু বিকৃত দেখায়। দরজার দিকে তাকালে দরজার ফ্রেমগুলি ভেতরের দিকে বেঁকে আছে বলে মনে হয়। দৃশ্য বস্তু হঠাৎ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় ("Jack-in-the-box")। এধরনের আরও নানা অসুবিধা হয়। আবার যেসব ক্ষেত্রে এক চোখে ছানি অপারেশন হয়েছে ও অন্য চোখটির দৃষ্টি প্রায় স্বাভাবিক আছে সে সব ক্ষেত্রে অবস্থাটা আর একটু জটিল হয়। এ অবস্থায় দু-চোখ একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। কারণ ছানি অপারেশন করা চোখটিতে +10.00 Dsp বা ঐ মাত্রার লেন্স লাগে ও অন্য চোখটিতে হয়তো লেন্স-এর দরকার হয়না বা হলেও অপারেশন করা চোখটির তুলনায় খুব কম পাওয়ারের লেন্স লাগে। ফলে দুচোখে এই দুরকম লেন্স থাকা চশমা পরলে একই দৃশ্য বস্তুর দু-চোখের দুই রেটিনায় যে দুটি ছবি পড়ে তারা খুব ছোট-বড় হয়ে যায় ও মস্তিষ্ক এই অসমান ছবিদুটিকে মেলাতে পারে না। এজন্য অপারেশনের পর চশমার সাহায্যে দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) সম্ভব হয়না—অর্থাৎ রুগী দুটি চোখ এক সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন না। অপারেশন করা চোখে কন্‌টাক্‌ট্‌ লেন্স নিলে অবশ্য এসব অসুবিধা অনেকাংশে দূর হয়। তবে কন্‌টাক্‌ট্‌ লেন্স খোলা- পরার ও পরিষ্কার

রাখার ব্যাপার আছে যা বেশি বয়সের লোকেরা অনেক সময় করে উঠতে পারেন না। ইনট্রাঅকুলার লেন্স দেওয়া থাকলে চোখটি স্বাভাবিক চোখের মতো হয়ে যায় ও উপরুক্ত অসুবিধা হয় না। অবশ্য ইন্ট্রা-অকুলার লেন্স সব ক্ষেত্রে দেওয়া যায় না। চোখে যদি কোন অসুখ থাকে (যেমন ডায়াবেটিস জনিত রেটিনার অসুস্থতা, গ্লকোমা, কর্নিয়ার অসুখ, - 7.00 Dsp'র বেশি ক্ষীণদৃষ্টি ইত্যাদি) তাহ'লে ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স দেওয়ার ঝুকি নেওয়া হয়না।

ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স নেওয়ার পরও কিছু কিছু জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে – যেমন গ্লকোমা, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা, ভিট্রেয়াসের প্রদাহ, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ইত্যাদি। অবশ্য এ জটিলতাগুলি ইনট্রাঅকুলার লেন্স না দিলেও হতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

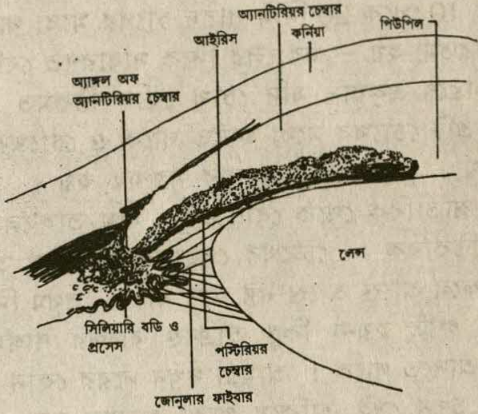
গ্লকোমা (Glaucoma)

গ্লকোমা কথাটা শুনলেই অনেকে ভয় পেয়ে যান। অনেকেরই ধারণা, গ্লকোমা হওয়া মানেই অন্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। গ্লকোমা রোগে যদিও চোখের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সময় মতো রোগ ধরা পড়লে ও বিশেষজ্ঞের নির্দেশ ঠিক মতো মেনে চললে এর থেকে অন্ধ হওয়ার কোন ভয় নেই।

চোখে আভ্যন্তরীণ চাপ ও গ্লকোমা

প্রথম পরিচ্ছেদে চোখের গঠন সম্বন্ধে জানতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সামনে থেকে পেছনে রয়েছে যথাক্রমে কর্নিয়া, আইরিশ ও লেন্স। কর্নিয়া ও আইরিশের মাঝখানের জায়গাটুকুকে বলে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার

(Ante-rior Chamber) বা সামনের কামরা (১০ নং ছবি)। কর্নিয়া ও



১০ নং ছবি

আইরিশ যে কোণে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাকে বলে অ্যাঙ্গল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার (Angle of anterior chamber) বা সামনের কামরার কোণ। আবার আইরিশ ও লেন্সের মাঝখানে জায়গাটুকুকে বলে পস্টিরিয়র চেম্বার (Posterior chamber) বা পেছনের কামরা। এই সামনের ও পেছনের কামরার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে পিউপিল বা তারারন্ধ্রের মারফত।

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সিলিয়ারি বডির কথা জেনেছি। এই সিলিয়ারি বডির পেছন দিকে রয়েছে কতকগুলি সিলিয়ারি প্রসেস। এই সিলিয়ারি প্রসেসগুলি থেকে সর্বদা ক্ষারিত হচ্ছে এক ধরনের জলীয় পদার্থ, যাকে একুয়াস হিউমার (Aquous humour) বলা হয়। সিলিয়ারি প্রসেস থেকে ক্ষারিত হয়ে একুয়াস প্রথমে পস্টিরিয়ার চেম্বারে জমা হয়। তার পর পিউপিল দিয়ে এটি চলে আসে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে। এরপর অ্যান্টিরিয়র চেম্বারের কোণ দিয়ে ঢুকে একুয়াস মূল রক্ত স্রোতের সঙ্গে ক্রমশ মিশে যায়।

সাধারণত যতটা একুয়াস তৈরি হয় ততটাই চোখ থেকে বেরিয়ে যায় ফলে, চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ একটি স্থায়ী ও স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে (কোন বেলুনের মধ্যে যতটা হাওয়া ভরা যায় ঠিক ততটা হাওয়াই যদি বেলুনের কোন ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে বেলুনের আভ্যন্তরীণ

চাপ যেমন একটি স্থায়ী মাত্রায় থাকে)। এই চাপকে বলে অকুলার টেন্‌সন্ (Ocular tension) বা ইনট্রাঅকুলার প্রেসার (Intraocular pressure) এটি সাধারণত 10 থেকে 20 মিমি পারদ চাপের মধ্যে থাকে (সকালে সন্ধ্যায় এর তারতম্য হয় – সকালের দিকে সাধারণত বেশি থাকে)। কিন্তু কোন কারণে একুয়াস যদি চোখ থেকে ঠিকমত বেরোতে না পারে তাহ'লে এটি চোখের মধ্যে জমতে থাকে ও চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যায়। এভাবেই গ্লকোমার সূত্রপাত হয়। যদি চোখের চাপ বেশিদিন স্বাভাবিক থেকে বেশি থেকে যায় তাহ'লে তা চোখের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। চোখের পেছনের দিকে যে অপটিক নার্ভ আছে তা এর ফলে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দিকে সরাসরি সামনের দৃষ্টির ক্ষতি হয়না কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির পার্শ্বদৃষ্টি (side-vision) কমে আসতে থাকে। আমরা যখন দূরের কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন সেই তাকিয়ে থাকা অবস্থায় তার আশে-পাশের জিনিসও (খুব স্পষ্ট না হলেও) দেখতে পাই। দৃষ্টির এই ব্যাপৃতিকে বলে ভিসুয়াল ফিল্ড (visual field)। গ্লকোমায় এই ভিসুয়াল ফিল্ড আস্তে আস্তে চারপাশ থেকে সংকুচিত হতে থাকে ও ক্রমে একটা সময় আসে যখন সমগ্র দৃষ্টিরই বিলুপ্তি ঘটে অর্থাৎ চোখটি অন্ধ হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি কিছু বুঝতে পারেন না কারণ সামনের দৃষ্টি ঠিক থাকে। কিন্তু পার্শ্বদৃষ্টি যখন অনেকটা কমে যায় তখন এটা উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য তখন হয়ত রোগটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ দিয়ে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করালে প্রথম অবস্থায় এটা ধরা পড়ে ও এধরনের বিপদ এড়ান যায়।

গ্লকোমার প্রকারভেদ

গ্লকোমা মূলত চার রকমের হয় :
১। ন্যারো অ্যাঙ্গল গ্লকোমা (Narrow angle glaucoma) ২। ওপন্ অ্যাঙ্গল গ্লকোমা বা ক্রনিক সিমপ্‌ল্ গ্লকোমা (Open angle glaucoma - chronic simple glaucoma) ৩। সেকেণ্ডারি গ্লকোমা (Secondary glaucoma) ৪। কনজেনিটাল গ্লকোমা (Congenital Glaucoma)।

ন্যারো অ্যাঙ্গল গ্লকোমা বা ক্ষীণ কোণ গ্লকোমা :

এ ধরনের গ্লকোমায় অ্যাঙ্গল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার খুব ক্ষীণ থাকে,

অর্থাৎ আইরিশ ও কর্নিয়ার মধ্যে ফাঁক খুব কম থাকে। এজন্য একুয়াস বেরোনোর রাস্তাটি সংকীর্ণ হয়ে যায় ও বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যতটুকু একুয়াস বেরোনোর দরকার তা বেরোতে পারেনা ও এর ফলে অকুলার টেনসন স্বাভাবিক থেকে বেশি হয়ে যায়।

ন্যারো অ্যাঙ্গল গ্লকোমায় চোখের টেনসন হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে। যেমন কোন কারণে যদি চোখে পিউপিল বা তারারন্ধ্র অনেক্ষণ বড় হয়ে থাকে থাকে (যেমন সিনেমা হলে অনেকক্ষণ থাকার পর) তখন আইরিশ অ্যাঙ্গল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বারকে আরও সংকীর্ণ করে দেয় ও একুয়াস প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে অকুলার টেনসন বেড়ে যায়। এ ঘটনাটি ঘটে হঠাৎ করে। চোখ আচমকা লাল হয়ে ওঠে (সাধারণত একটি চোখ) প্রচণ্ড ব্যথা হয়, বমি পায় বা হয়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ও কিছু দূরে কোন আলোর দিকে তাকালে তার চার-পাশে রামধনুর মতো রক্তের বৃত্ত দেখায়। এরকম হলে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ বার বার এটা হতে থাকলে চোখের লাল ভাব ও ব্যথা একটা স্থায়ী রূপ নিয়ে নেয় ও রুগীর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। দৃষ্টি শক্তি কমে যায় ও ভিসুয়াল ফিল্ড ছোট হতে থাকে। সময় মত ও নিয়মিত চিকিৎসা না হলে অন্ধত্বই হয় এর শেষ পরিণতি।

এ ধরনের গ্লকোমায় ওষুধ দিয়ে সাময়িকভাবে অবস্থা আয়ত্তে আনা গেলেও একমাত্র অপারেশনের দ্বারাই স্থায়ী সমাধান সম্ভব। আজকাল লেজার রশ্মির সাহায্যেও এর অপারেশন করা হয়।

ওপন অ্যাঙ্গল গ্লকোমা (মুক্ত কোণ গ্লকোমা) :

এ ধরনের গ্লকোমায় আইরিশ ও কর্নিয়ার মধ্যের কোণটি অর্থাৎ অ্যাঙ্গল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার প্রশস্ত থাকে। কিন্তু একুয়াস অ্যাঙ্গল অফ অ্যান্টিরিয়র চেম্বার দিয়ে বেরোনোর পর চোখের ভেতর যে সব কোষকলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তার অস্বাভাবিকতার জন্য এর প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে অকুলার টেনসন বেড়ে যায়। ন্যারো অ্যাঙ্গল গ্লকোমায় – যেমন প্রাথমিক অবস্থায় উপসর্গ দেখা যায় ওপন অ্যাঙ্গল গ্লকোমায় কিন্তু তা হয়না। প্রাথমিক অবস্থায় রুগী কিছু বুঝতে পারেন না। রোগটি আসে প্রায় গা ঢাকা দিয়ে। অনেক সময় অন্য কোন

কারণে চোখ দেখাতে গিয়ে (যেমন চশমার জন্য) এটা বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে। এজন্য চল্লিশ বছর বয়সের পর বছরে অন্তত একবার চোখ পরীক্ষা করান দরকার। বিশেষ করে যাদের বংশে এই রোগ হয়েছে তাদের ছ'মাস অন্তর চোখ দেখান দরকার।

এধরনের গ্লকোমায় অনেক সময় ওষুধের সাহায্যেই অকুলার টেনসন স্বাভাবিক রাখা যায় ও অপারেশন অনিবার্য হয়ে ওঠে না। তবে সে ক্ষেত্রে সারা জীবন নিয়মিতভাবে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এটা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয় অথবা ওষুধ যদি অকুলার টেনসন স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে না পারে, তাহলে অপারেশনের প্রশ্ন আসবে। এক্ষেত্রেও লেজার রশ্মি ব্যবহার হচ্ছে।

সেকেণ্ডারি গ্লকোমা :

অনেক সময় একটি স্বাভাবিক চোখেও গ্লকোমা হতে পারে অন্য কোন কারণে। কয়েকটি কারণ হল – চোখে আঘাত লেগে চোখের লেন্স যদি সামনের দিকে স্খলিত হ'য়ে আইরিশকে কর্নিয়ার ওপর চেপে ধরে, চোখে প্রদাহ (যেমন আইরিডো সাইক্লাইটিস) হলে, কোন কোন ওষুধে যেমন হাইড্রোকর্টিসন ড্রপের ব্যবহারের জন্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কারণের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়।

জন্মগত গ্লকোমা বা বুপথালমস্ (Buphthalmos) :

যে পথ দিয়ে একুয়াস প্রবাহিত হয় শিশুর ভ্রূণাবস্থায় সেটি ঠিক মত তৈরি না হওয়ার জন্য একুয়াসের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধা পায় ও জন্মগত গ্লকোমা হয়। শিশুদের 3 থেকে 11 শতাংশের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ দু-চোখেই হয় তবে এক চোখেও হতে পারে।

তিন মাস বয়স পর্যন্ত চোখের কোষকলা নরম থাকে ও শিশুর যদি গ্লকোমা হয় তাহলে চোখের আভ্যন্তরীণ উচ্চচাপের জন্য চোখ স্বাভাবিক থেকে বড় হয়ে যায়। চোখ দুটি স্বাভাবিক থেকে বড, দেখানোর জন্যই এ রোগের আরেক নাম বুপথালমস বা 'ষাঁড়ের চোখ'।

এ রোগের উপসর্গ শিশুর এক থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই দেখা যায়। চোখ দিয়ে জল পড়ে, চোখে আলো সহ্য হয়না – শিশু সব সময় চোখ বন্ধ করে রাখতে চায়। কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায় ও অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে যায়।

এ রোগে চিকিৎসা অপারেশন তবে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশনে সাফল্য না আসলে যতদিন পারা যায় ওষুধের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে অধুনা অপারেশন প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য প্রায়শ ক্ষেত্রেই সাফল্য আসে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চোখের প্রতিসরণ দোষ (Refractive error) ও তার প্রতিকার

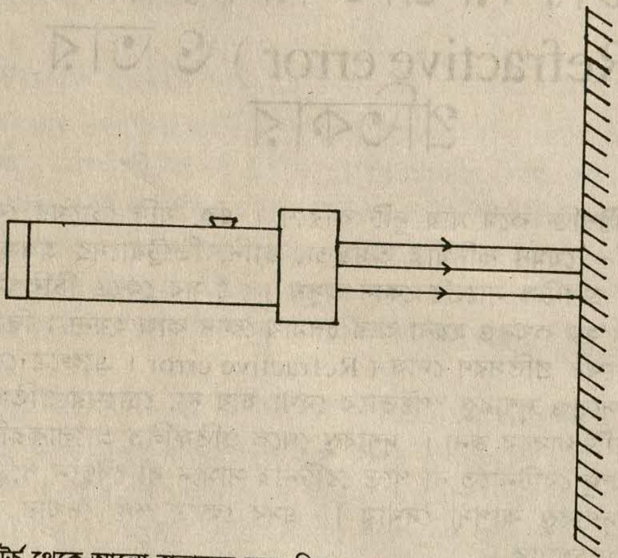
চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় দুটি কারণে। এক, যদি চোখের কোন অসুখ হয় – যেমন কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা, ছানি, ভিট্রেয়াসের অস্বচ্ছতা, রেটিনা বা অপটিক নার্ভের কোন অসুখ। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসায় কখনও ফল হয় কখনও হয়না আর চশমায় কোন কাজ হয়না। দ্বিতীয় কারণ, চোখের প্রতিসরণ দোষ (Refractive error। এক্ষেত্রে চোখ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যবস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতার ত্রুটি থাকার জন্য। দৃশ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে না পড়ে রেটিনার সামনে বা পেছনে পড়ে ও এর ফলে দৃশ্যবস্তু ঝাপসা দেখায়। এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখার জন্য প্রয়োজন হয় চশমার।

চশমার দুটি অংশ – ফ্রেম ও লেন্স। ফ্রেমের কাজ চশমার লেন্স দুটিকে চোখের সামনে ঠিক জায়গায় ধরে রাখা ' লেন্স দুটি আলোক রশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে পড়তে চোখকে সাহায্য করে অর্থাৎ চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতার ঘাটতিটুকু পূরণ করে।

প্রতিসরণ (Refraction)

চোখের প্রতিসরণ দোষ ও তার প্রতিকারের উপায় জানতে হলে প্রতিসরণ কী তা জানা দরকার।

আমরা বোঝার সুবিধার জন্য ধরে নি যে আলো রশ্মির আকারে সরল রেখায় চলে। এই সরল রেখায় চলা আলোকরশ্মি একটি স্বচ্ছ মাধ্যম দিয়ে যখন যায় তখন তার দিক পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ আলোক রশ্মিটি বেঁকে যায়না। যেমন বাতাস একটি স্বচ্ছ মাধ্যম। এর মধ্যে আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলবে একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর। আমরা যদি একটি টর্চ থেকে আলো দেয়ালে ফেলি তাহলে আলোকরশ্মিগুলি টর্চ ও দেয়ালের মাঝখানের মাধ্যম, বাতাসের মধ্যে দিয়ে সোজা দেয়ালে গিয়ে পড়বে – কোন দিকে বেঁকে যাবেনা। (১১ নং ছবি)।



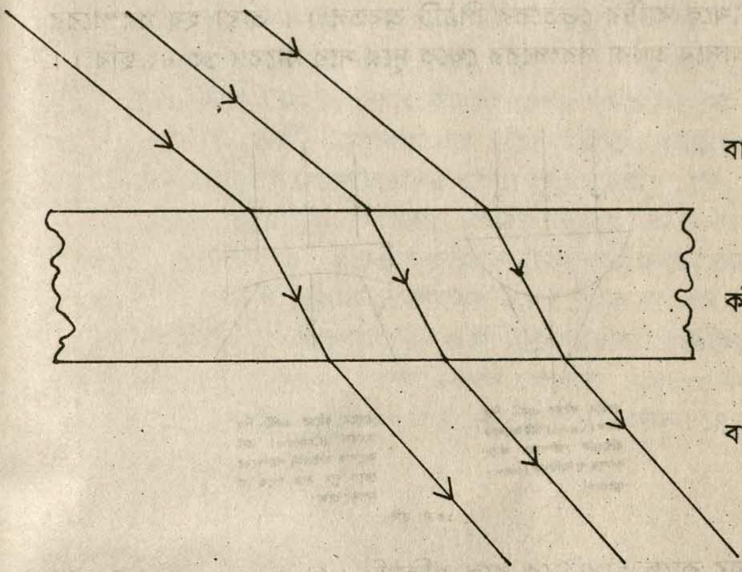
টর্চ থেকে আলো বাতাসের মধ্যে দিয়ে সোজা যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে না।

১১ নং ছবি

কিন্তু আলো যখন একটি মাধ্যম থেকে আর একটি ভিন্ন মাধ্যমে (যেমন বাতাস থেকে কাঁচে) প্রবেশ করে তখন তার দিক পরিবর্তন হয়। এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে যাবার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে যে দিক পরিবর্তন হয় তাকেই আলোর প্রতিসরণ বলে।

১২ নং ছবিতে বাতাস ও কাঁচ দুটি ভিন্ন মাধ্যম দেখান হয়েছে। আলোক রশ্মি পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসে কাঁচে প্রবেশ করে

দিক পরিবর্তন করছে অর্থাৎ প্রতিসৃত হচ্ছে। আবার কাঁচ থেকে বেরিয়ে



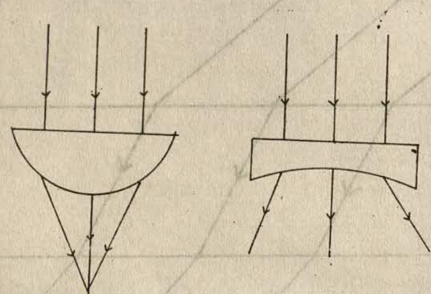
১২ নং ছবি

আলোক রশ্মি যখন ফের বাতাসে প্রবেশ করছে তখন তারা আর একবার প্রতিসৃত হচ্ছে।

লেন্স (Lens)

১২ নং ছবিতে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা দরকার। আলোক রশ্মি কাঁচে প্রবেশ করার আগে পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল ও তারা যখন কাঁচ থেকে বেরিয়ে বাতাসে প্রবেশ করছে তখনও তারা পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল থেকে যাচ্ছে, কোন বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে না। এর কারণ ছবিতে দেখান কাঁচের দুটি পৃষ্ঠই সমান্তরাল ও সমতল। তাই ছবির

কাঁচটিকে লেন্স বলা যাবে না । কারণ লেন্সের ধর্ম হ'ল আলোক রশ্মিগুলিকে একটি ফোকাস বিন্দুতে মিলিত করা । ছবির কাঁচের একটি বা দুটি পিঠ যদি উত্তল (Convex) বা অবতল (Concave) হয় তাহলে প্রতিসৃত রশ্মিগুলি সমান্তরাল থাকবে না (একটি বাটি যদি উপুড় করে রাখি তাহলে তার বাইরের পিঠটি উত্তল আবার সোজা করে রাখলে বাটির ভেতরের পিঠটি অবতল) । তারা হয় পরস্পরের কাছে আসবে অথবা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবে (১৩ নং ছবি) ।



এখানে কাঁচের একটি পিঠ উত্তল (convex) তাই আলোক রশ্মিগুলি পরস্পরের কাছে আসছে বা অভিসৃত (conve-rgence)

এখানে কাঁচের একটি পিঠ অবতল (Concave) তাই আলোক রশ্মিগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা অপসৃত হচ্ছে।

১৩ নং ছবি

পরস্পরের কাছে আসাটাকে বলে অভিসৃতি (Convergence) ও দূরে সরে যাওয়াটাকে বলে অপসৃতি (Diver-gence) । দুটি মসৃণ তল দ্বারা বেষ্টিত (যার একটি বা দুটি বক্র) কোন স্বচ্ছ মাধ্যম, যা আলোকরশ্মিকে অভিসৃত বা অপসৃত করতে পারে তাকেই লেন্স বলে ।

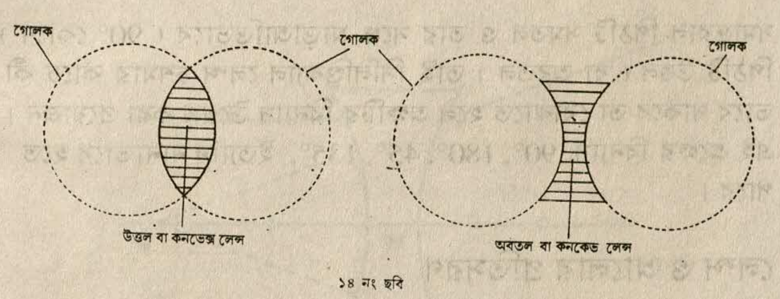
লেন্সেরপ্রকারভেদ :

চশমার লেন্স তৈরি হয় কাঁচ বা প্লাস্টিক দিয়ে । কাঁচের মধ্যে ক্রাউন গ্লাস ব্যবহার হয় বেশি । এছাড়া ফ্লিন্ট ও বেরিয়াম গ্লাসও ব্যবহার করা হয় । প্লাস্টিক লেন্স প্রধানত দু-রকমের হয় : PMMA ও CR39 (Allyl diglycol carbonate)

প্লাস্টিক লেন্সের প্রধান সুবিধা হল এর ওজন কাঁচের থেকে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ কম । সূর্য রশ্মির মধ্যে যে অতি বেগুনী রশ্মি আছে তা চোখে ছানি পড়ার একটি কারণ বলে মনে করা হয় । প্লাস্টিক

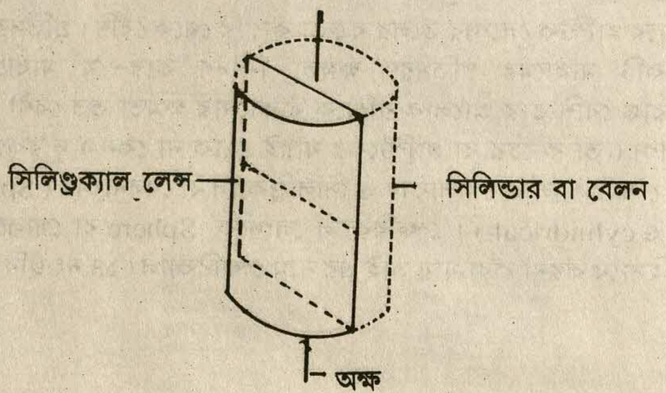
লেন্স সূর্য রশ্মির এই অতি বেগুনী অংশের প্রায় নব্বই শতাংশ আটকে দেয়। এছাড়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক লেন্সের একটি সুবিধা এটি কাঁচের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়না তাই লেন্স ভেঙে গিয়ে চোখে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবে প্লাস্টিক লেন্সের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্লাস্টিক লেন্সে সহজে দাগ পড়ে যায়। অবশ্য CR-39 লেন্সে সহজে দাগ পড়ে না। যারা গ্রাইণ্ডিং বা ওয়েল্ডিং করেন তাঁদের চশমার কাঁচে ছোট ছোট গর্ত হয়ে যায় (Pitting) তাদের ক্ষেত্রে CR-39 লেন্স কাঁচের লেন্স থেকে ভালো। প্লাস্টিক লেন্সের আর একটি অসুবিধা এর প্রতিসরাঙ্ক কম হওয়ার জন্য একই পাওয়ারে প্লাস্টিক লেন্সের তলের বক্রতা কাঁচের থেকে বেশি (প্রতিসরাঙ্ক – একটি মাধ্যমের প্রতিসরণ ক্ষমতা নির্দেশ করে–যে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বেশি তার আলোক রশ্মিকে বাঁকানোর ক্ষমতা তত বেশী)।

লেন্স (তা কাঁচের বা প্লাস্টিকের যারই হোক না কেন) দু রকমের হয় – স্ফেরিক্যাল বা গোলাকার ও সিলিণ্ড্রিক্যাল বা বেলনাকার (Spherical ও cylindrical)। স্ফেরিক্যাল লেন্সকে Sphere বা গোলকের অংশ হিসাবে কল্পনা করা যায় তাই এর নাম স্ফেরিক্যাল (১৪ নং ছবি)।



১৪ নং ছবি

স্ফেরিক্যাল লেন্স দু-রকমের হয়–উত্তল (Convex) ও অবতল (Concave)। উত্তল লেন্সের মাঝখানটা মোটা ও কিনারাগুলি পাতলা (স্থূলমধ্য)। অবতল লেন্সের মাঝখানটা পাতলা, কিনারাগুলি মোটা (ক্ষীণমধ্য)। একটি লেন্সের একপিঠ উত্তল ও অপরপিঠ সমতল বা অবতল হতে পারে। সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্স একটি সিলিণ্ডার বা স্তম্ভকের (যেমন বেলনা) অংশ হিসাবে কল্পনা করা যায়। সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সকে বেলনাকার লেন্সও বলা হয়। এখানে মূল স্তম্ভকের অক্ষটিই সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সের অক্ষ (Axis)। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে অক্ষের সঙ্গে



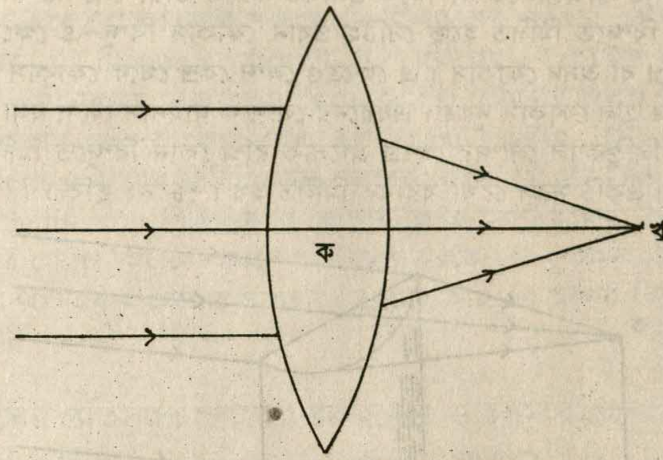
১৫ নং ছবি

সমান্তরাল পিঠটি সমতল ও তার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে (90° কোণে) পিঠটি উত্তল (বা অবতল) তাই সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্স চশমার কাঁচে কী ভাবে থাকবে তা বোঝাতে হলে অক্ষটির বিন্যাস উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অক্ষের বিন্যাস 90°, 180°, 45°, 135°, ইত্যাদি নানাভাবে হতে পারে।

লেন্স ও আলোর প্রতিসরণ

উত্তল লেন্স আলোকরশ্মিগুলিকে অভিসৃত করে। ১৬ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে যে বাঁ দিক থেকে লেন্সের অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল আলোক রশ্মি এসে একটি উত্তল (এ ক্ষেত্রে উভত্তল) লেন্সে অভিসৃত হয়ে ডানদিকে একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে – এই বিন্দুটিকে বলে

প্রধান ফোকাস বিন্দু (Principal focus)। লেন্স কেন্দ্র থেকে ফোকাস

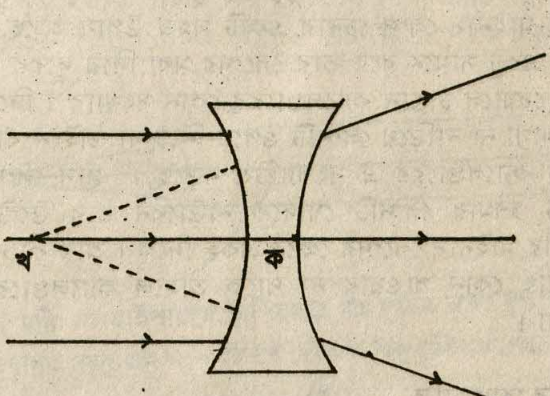


ক লেন্স কেন্দ্র খ-ফোকাস বিন্দু কখ-ফোকাস দূরত্ব

১৬ নং ছবি

বিন্দুর দূরত্বকে বলে ফোকাস দূরত্ব (Focal Length)। এই ধরনের লেন্সকে প্লাস লেন্স বলা হয়।

অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এখানে বাঁ দিক থেকে (১৭ নং ছবি) আলোক রশ্মি এসে লেন্সে প্রবেশ করে অপসৃত

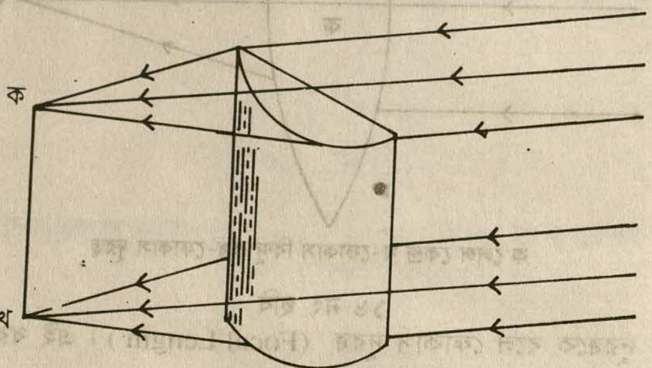


ক লেন্সের কেন্দ্র খ- ফোকাস বিন্দু (অসদ ফোকাস)। ক-খ ফোকাস দূরত্ব

১৭ নং ছবি

হচ্ছে ও তারা আপাত দৃষ্টিতে কোন বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে অপসৃত রশ্মিগুলিকে বাঁ দিকে প্রলম্বিত করলে তারা লেন্সের বাঁ দিকে যে বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে সেটিই প্রধান ফোকাস বিন্দু—এ ক্ষেত্রে virtual বা অসদ ফোকাস। এ ক্ষেত্রেও লেন্স কেন্দ্র থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্ব হ'ল ফোকাস দূরত্ব। এধরনের লেন্সকে মাইনাস লেন্স বলা হয়।

সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি কোন বিন্দুতে মিলিত না হয়ে একটি সরল রেখা বরাবর মিলিত হয় (১৮ নং ছবি)।



মিলিন্ড্রক্যাল লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মিগুলি একটি সরলরেখায় (ক খ) মিলিত হচ্ছে।

১৮ নং ছবি

প্লাস ও মাইনাস লেন্স চেনার একটি সহজ উপায় আছে। আপনার চশমাটি একটু সামনে ধরে তার লেন্সের মধ্য দিয়ে দূরের কোন কিছুর (যেমন দেয়ালে টাঙান ক্যালেণ্ডারের কোন সংখ্যার) দিকে তাকান। এরপর মাথা না নাড়িয়ে লেন্সটি ওপরে-নিচে বা ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ান। দেখবেন ক্যালেণ্ডারের ঐ সংখ্যাটিও নড়ছে। প্লাস লেন্স-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি চশমার লেন্সটি যেদিকে নাড়াবেন তার উল্টোদিকে সরে যাবে আর মাইনাস লেন্সের ক্ষেত্রে একই দিকে। আর কাঁচটি যদি প্লেন হয় অর্থাৎ কোন পাওয়ার না থাকে তাহলে ক্যালেণ্ডারের সংখ্যাটি নড়বে না।

লেন্সের পাওয়ার

লেন্সের পাওয়ার নির্ভর করে তার ফোকাস দূরত্বের ওপর। লেন্সের পাওয়ার যত বেশি তার ফোকাস দূরত্ব তত কম ও তার তলের বক্রতা

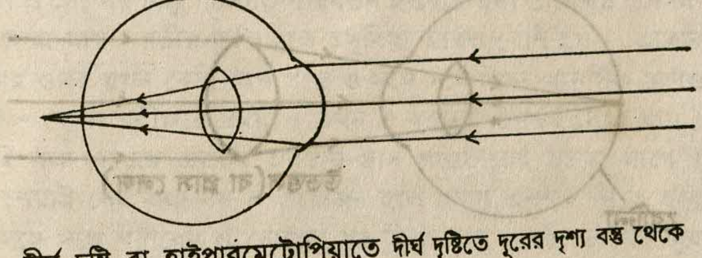
তত বেশি। এই জন্য প্লাস লেন্সের ক্ষেত্রে পাওয়ার যত বেশি লেন্সের মাঝখানটিও তত মোটা আর মাইনাস লেন্সের ক্ষেত্রে মাঝখানটি তত পাতলা। যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এক মিটার তার পাওয়ার এক ডাইওপটার (1 dioptre বা সংক্ষেপে 1D) ধরা হয়। ফোকাস দূরত্ব যদি $^1/_2$ মিটার হয় তাহলে তার পাওয়ার 2 D, 2 মিটার হলে 0.5D। স্ফেরিক্যাল লেন্সের ক্ষেত্রে লেখা হয় Dsph (অর্থাৎ Dioptre SPHerical) আর সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্সের ক্ষেত্রে Dcyl (Dioptre CYLindrical)। সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্য অক্ষের বিন্যাস চশমার লেন্সে কিভাবে থাকবে তা উল্লেখ করতে হবে (যেমন +2.50 Dcyl 90° অর্থাৎ লেন্সের পাওয়ার 2.50D আর এর অক্ষের বিন্যাস 90°)।

চোখের প্রতিসরণ দোষের রকমফের ও চশমার লেন্স :

চোখের প্রতিসরণ দোষ প্রধানত চার রকমের : দীর্ঘদৃষ্টি (Hypermetropia বা hyperopia), ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia), নকুলান্ধতা (Astigmatism) ও চালশে (Presbyopia)

দীর্ঘদৃষ্টি (Hypermetropia)

এক্ষেত্রে দূরের দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলি চোখে প্রতিসৃত হবার পর তাদের ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে না পড়ে রেটিনার পেছনে পড়ে (১৯ নং ছবি)। এটা নির্ভর করে চক্ষুগোলকের



দীর্ঘ দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়াতে দীর্ঘ দৃষ্টিতে দূরের দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত সমান্তরাল অলোকরশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনার পেছনে পড়ছে।

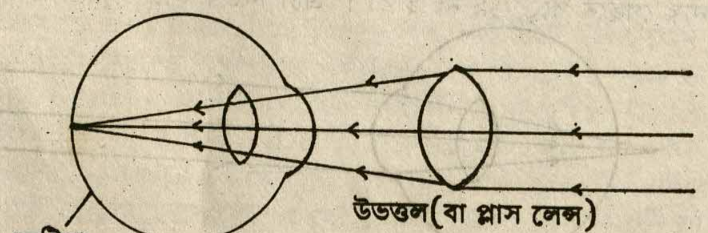
১৯ নং ছবি

সামনের পেছনের ব্যাসের বা অক্ষের দৈর্ঘ্যের ও কর্নিয়া ও লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতার ওপর। চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্য যদি কম হয় (অর্থাৎ

চোখটি যদি স্বাভাবিক থেকে ছোট হয়), কর্নিয়ার বক্রতা যদি কম হয় বা লেন্সের তলের বক্রতা বা তার প্রতিসরণ ক্ষমতা যদি কম হয় তাহলে দীর্ঘদৃষ্টি হয়। কর্নিয়ার বক্রতা যদি কম হয় তাহলে তার প্রতিসরণ ক্ষমতা কম হবে ও ফলে তার পাওয়ার তত কম হবে। আমরা দেখেছি যে পাওয়ার যত কম ফোকাস দূরত্ব তত বেশি। এই ফোকাস দূরত্ব যদি চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্যের থেকে বেশি হয় তাহ'লে স্বভাবতই ফোকাস বিন্দু রেটিনার পেছনে পড়বে। লেন্সের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। আবার চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্য যদি কম হয় তাহ'লে কর্নিয়া ও লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতা স্বাভাবিক হলেও ফোকাস দূরত্ব রেটিনার পেছনে পড়বে।

তবে চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্যের স্বল্পতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘদৃষ্টির জন্য দায়ী থাকে। জন্মের পরই অধিকাংশ চোখই +2.00D থেকে +3.00D দীর্ঘদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। বয়স যত বাড়তে থাকে ততই শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে চোখেরও কিছুটা বৃদ্ধি হয় ও চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘদৃষ্টিও কমে আসতে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি এই বৃদ্ধি ঠিক মত না হয় তাহলে অক্ষের দৈর্ঘ্য কম থেকে যায় (কারণ চোখটি একটু ছোট থেকে যায়) ও দীর্ঘ দৃষ্টি হয়।

দীর্ঘদৃষ্টির সংশোধন করতে হলে প্রয়োজন হয় উত্তল বা প্লাস লেন্সের। ২০ নং ছবি থেকে এটা বোঝা যাবে।



দীর্ঘ দৃষ্টিতে উভতল লেন্স ব্যবহার করে দূর থেকে আসা সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলিকে চোখে প্রবেশ করার আগেই কিছুটা অভিসৃত করে নেওয়া হচ্ছে ফলে ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে পড়ছে।

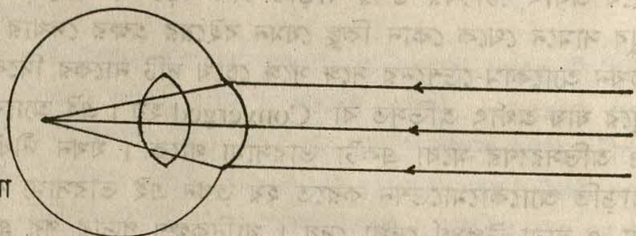
২০ নং ছবি

দীর্ঘদৃষ্টি থাকলে দূরের জিনিস থেকে কাছের জিনিস (যেমন বই পড়া বা সেলাই করা) দেখতে বেশি অসুবিধা হয় । দূরের জিনিস দেখতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়না যদি না এই দোষটি বেশি মাত্রায় থাকে । 33 সে মি বা তার কাছাকাছি দূরত্বে বই রেখে পড়তে হলে চোখের স্বাভাবিক অ্যাকোমোডেশন ক্ষমতা 3D হওয়া প্রয়োজন । যদি চোখটির 2D দীর্ঘদৃষ্টি থাকে তাহ'লে 33 সে মি দূরে পড়তে হলে 2+3=5D অ্যাকোমডেশন ক্ষমতার প্রয়োজন হবে । এই বাড়তি অ্যাকো-মডেশন করার জন্য সিলিয়ারি পেশীকে আরও বেশি সংকুচিত হ'তে হবে অর্থাৎ চোখের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে । এছাড়া চোখ যখন খুব সামনে থেকে কোন কিছু যেমন বইয়ের অক্ষর দেখার চেষ্টা করে তখন অ্যাকোম-ডেশনের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি নাকের দিকে খানিকটা ঘুরে যায় অর্থাৎ অভিসৃত বা Converged হয় । এই অ্যাকোমোডেশন ও অভিসরণের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে । যখন দীর্ঘদৃষ্টির জন্য বাড়তি অ্যাকোমোডেশন করতে হয় তখন এই ভারসাম্য বজায় থাকে না ও নানা উপসর্গ দেখা দেয় । খানিকক্ষণ পড়ার পর ক্লান্তি আসে, চোখ করকর করে, চোখে জল আসে ও চোখে ও মাথায় ব্যথা হয় । খানিকক্ষণ পড়ার পর বইয়ের অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায় । বয়স যখন কম অর্থাৎ সিলিয়ারি পেশীর ক্ষমতা যখন বেশি তখন অল্পমাত্রার দীর্ঘদৃষ্টিতে কোন অসুবিধা হয়না ও অনেক সময় এটা ধরাও পড়ে না । এর কারণ চোখের নিজস্ব অ্যাকোমোডেশন ক্ষমতা এই ঘাটতিটুকু পূরণ করে নেয় । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সিলিয়ারি পেশীর ক্ষমতা কমে যাওয়া ও লেন্সের কিছু গঠনগত পরিবর্তন হওয়ার জন্য উল্লিখিত উপসর্গ-গুলি দেখা যায় । শরীর দুর্বল হলে অসুবিধা আরও বেশি হয় । আবার চোখের ওপর যখন বেশি চাপ পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে যখন মানসিক চাপও থাকে – যেমন পরীক্ষার সময় – তখন এ ধরনের উপসর্গ দেখা যায় । আগেই বলা হয়েছে এরকম অবস্থায় প্লাস পাওয়ারের চশমা লাগে । কিন্তু চশমাই শেষ কথা নয় । প্রয়োজন হলে চশমা অবশ্যই নিতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ও চোখের যত্ন নিতে হবে । বই চোখের খুব কাছে (অর্থাৎ 33 সেমি-এর কম) নিয়ে পড়া বা বেশি রাত্রি জেগে পড়া বন্ধ করতে হবে । প্রয়োজন হলে ভোরে উঠে পড়তে হবে । তাছাড়া প্রয়োজন সুষম খাবার – মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সয়াবিন, ডাল, শাক-সবজি (বিশেষ করে সবুজ পাতাওয়ালা সবজি) ।

প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মুক্ত বাতাসে খেলাধূলা ও ব্যায়াম ও খুব দরকার। দূরদৃষ্টিতে যদি শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় — তাহলে অনেক সময় চশমার আর প্রয়োজন হয় না।

ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia)

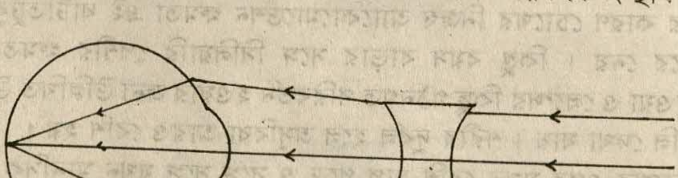
ক্ষীণদৃষ্টিতে দূরের দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলি চোখে প্রতিসৃত হওয়ার পর ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে না পড়ে রেটিনার সামনে পড়ে ও দৃশ্য বস্তু ঝাপসা দেখায় (২১ নং ছবি)। এর



দূর থেকে আসা সমান্তরাল আলোক রশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনার সামনে পড়ছে।

২১ নং ছবি

সংশোধন করতে অবতল বা মাইনাস লেন্সের প্রয়োজন হয় (২২ নং ছবি)।



ক্ষীন দৃষ্টি বা মাইওপিয়াতে দূর থেকে আসা সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলিকে একটি অবতল লেন্সের সাহায্যে প্রতিসৃত করা হচ্ছে ফলে ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে পড়ছে।

২২ নং ছবি

ক্ষীণদৃষ্টিতে চোখের অক্ষের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক থেকে বেশি হয় অর্থাৎ চোখটি একটু বড় হয়। কর্নিয়া লেন্সের তলের বক্রতা বেশি হলে ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া সম্ভব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোখের অক্ষের

দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন চোখের কর্নিয়া ও লেন্সের তলের বক্রতা স্বাভাবিক থেকে কম হয়। চোখ যেন নিজের ক্ষীণদৃষ্টি নিজেই সংশোধন করার চেষ্টা করছে। তবে কর্নিয়ার অসুস্থ অবস্থায় অনেক সময় বক্রতা অনেক বেড়ে যায় (কেরাটো কোনাস)। আবার লেন্সের বক্রতা অনেক সময় বেশি হয় (লেন্টিকোনাস)। চোখে যখন ছানি পড়ে তখন লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতা বেড়ে যাবার জন্য ক্ষীণদৃষ্টি হয়। ডায়াবেটিস রোগে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্সের জলীয় ভাগ বেড়ে যায় ও লেন্সটি ফুলে ওঠে। এর ফলে লেন্সের তলের বক্রতা বেড়ে যায় ও ক্ষীণদৃষ্টি হয়। এছাড়া ডায়াবেটিসে একই কারণে লেন্সের চারপাশের তুলনায় মাঝখানের প্রতিসরাঙ্ক বেড়ে যায় ও এটাও ক্ষীণ দৃষ্টির একটা কারণ।

তবে কম বয়সে যে ক্ষীণদৃষ্টি হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখে অক্ষের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার জন্য। দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ চোখেই +2.00 থেকে +3.00 Dsp প্রতিসরণ দোষ থাকে (কারণ চোখটি তখন অপেক্ষকৃতভাবে ছোট) ও শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোখে বৃদ্ধির হওয়ার দরুন এটি কমে আসতে থাকে। কিন্তু চোখের বৃদ্ধি স্বাভাবিক থেকে বেশি মাত্রায় হলে অক্ষের দৈর্ঘ্যও স্বাভাবিক থেকে বেশি হয়ে যায়। এর ফলে ক্ষীণদৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধি যতদিন চলে ততদিন ক্ষীণদৃষ্টিও বাড়তে থাকে ও এর সংশোধক লেন্সের পাওয়ারও ক্রমশ বাড়াতে হয়। তবে 20-25 বছর বয়সের পর সাধারণত আর বাড়ে না।

ক্ষীণদৃষ্টি বা মাইয়োপিয়া দু-রকমের হয়, সিম্প্ল্ ও প্যাথোলজিক্যাল বা প্রোগ্রেসিভ মাইয়োপিয়া। সিম্প্ল্ মাইয়োপিয়াতে চোখের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সংশোধক লেন্সের পাওয়ার বাড়তে থাকলেও চোখ সুস্থ থাকে। সঠিক পাওয়ারের লেন্সের সাহায্যে এক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক থাকে, লেন্সের পাওয়ার যতই হকনা কেন। তাই এক্ষেত্রে বছর বছর লেন্সের পাওয়ার বাড়ার জন্য চিন্তা করার কোন কারণ থাকে না। প্রোগ্রেসিভ বা প্যাথোলজিক্যাল মাইয়োপিয়াতে ব্যাপারটা একটু জটিল। এক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নানা জৈবিক পরিবর্তন শুরু হয়। চশমার পাওয়ারের সঙ্গে অনেক সময় এই পরিবর্তনের সঙ্গতি থাকেনা –4.00Dsp বা –5.00Dsp পাওয়ারেই

চোখের অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে যায় । অবশ্য কখনও কখনও চোখে পাওয়ার –25.00Dsp বা –30.00 Dsp পর্যন্ত বেড়ে যায় অথচ এই পাওয়ারের চশমাও স্বাভাবিক দৃষ্টি দিতে পারেনা । এর কারণ চোখের ভেতর কতকগুলি জৈবিক পরিবর্তন । এর মধ্যে সবথেকে উদ্বেগজনক হল কোরয়েড ও রেটিনার অবক্ষয় (Chorioretinal degeneration) । এর ফলে রেটিনার কিছু কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়, রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয় ও রেটিনাল ডিটাচমেন্টও হতে পারে । এই জন্য যাদের বেশি মাত্রায় মাইয়োপিয়া আছে, বিশেষ করে প্রগ্রেসিভ মাইয়োপিয়াতে কোন ভারী জিনিস তোলা বা হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়া উচিত নয় । মাটি থেকে কিছু তুলতে হলে কোমর বেঁকিয়ে নিচু না হয়ে হাঁটু ভাজ করে নিচু হয়ে তোলা উচিত । কোন দূর পাল্লার যাত্রায় বাস বা মোটর গাড়িতে না গিয়ে সম্ভব হলে ট্রেনে যাওয়া উচিত ।

প্রগ্রেসিভ মাইয়োপিয়া সাধারণত বংশগত হয় আবার জিনের মিউ-টেশনের জন্য কোন একটি প্রজন্মে আরম্ভ হতে পারে ।

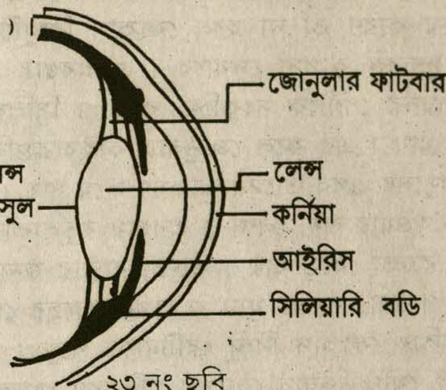
দূরদৃষ্টির মত ক্ষীণদৃষ্টিতেও শুধু চশমা নিলেই হবে না, শরীর ও চোখের যত্ন নিতে হবে । আর একটা কথা । মাইওপিয়া থাকলেই পড়াশুনা কমান বা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই । সঠিক পাওয়ারের চশমা পরলে ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে আর বেশি রাত জেগে না পড়লেই হল ।

চালশে (Presbyopia)

চল্লিশ বা তার কাছাকাছি বয়সে সামনে থেকে ছোট জিনিস দেখতে (যেমন বই পড়তে বা সূচে সুতো পরাতে) অসুবিধা হয় । এর কারণ কি ?

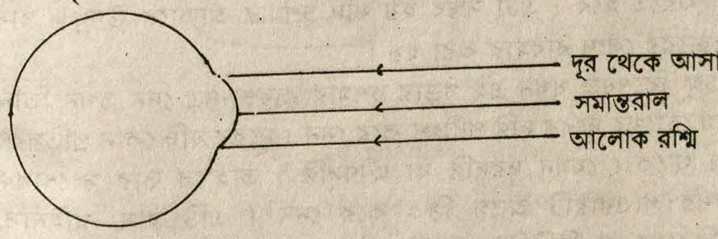
প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে আমাদের চোখের লেন্স ঘিরে রয়েছে একটি আবরণ বা ক্যাপসুল (৩ নং ছবি) । ও এই ক্যাপসুলের মধ্যে আছে জেলির মতন নরম লেন্স বস্তু (পাকা আমের খোসার ভেতরে নরম শাঁসের মতো) । এই ক্যাপসুলটি রবারের মত স্থিতিস্থাপক । লেন্স ঝোলানো থাকে সিলিয়ারি বডি থেকে কতকগুলি খুব সূক্ষ্ম জেনুলার ফাইবার দ্বারা । সিলিয়ারি বডি (যা আসলে কতগুলি মাংস পেশীর সমষ্টি) একটি রিং-এর মত স্ক্লেলার ভেতরের দিকে

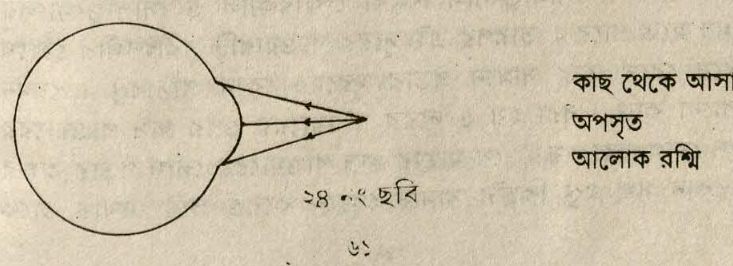
আটকান আছে ও লেন্স এর মাঝখানে জোনুলার ফাইবার দিয়ে ঝোলান আছে (২৩ নং ছবি) ।



২৩ নং ছবি

জোনুলার ফাইবারগুলি সিলিয়ারি বডি থেকে বেরিয়ে লেন্স ক্যাপসুলে আটকে থাকে। আমরা যখন দূরের দিকে তাকাই তখন সিলিয়ারি বডি শ্লথ অবস্থায় থাকে ও রিংটি বড় হয়ে যায়। ফলে লেনস ক্যাপসুলের ওপর জোনুলার ফাইবারের টান বেড়ে যায় ও লেন্সটি চ্যাপ্টা হয়ে যায় অর্থাৎ এর তলের বক্রতা কমে মায়। এক্ষেত্রে দূরের দৃষ্টি যদি স্বাভাবিক হয় তাহ'লে দূরের কোন জিনিস থেকে প্রতিফলিত সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলি চোখে প্রতিসৃত হয়ে ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে পড়ে। কিন্তু আমরা যখন কোন কাছের জিনিসের (যেমন এক-দেড় ফুট দূরে) দিকে তাকাই তখন তার থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলি সমান্তরাল থাকে না—অপসৃত অবস্থায় থাকে (২৪ নং ছবি)। এ অবস্থায় আলোকরশ্মিগুলি





২৪ নং ছবি

ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে ফেলতে হলে চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা বাড়াতে হয় কারণ তা না হলে ফোকাস বিন্দুটি রেটিনার পেছনে পড়বে ও দৃশ্যবস্তু ঝাপসা দেখাবে। এ অবস্থার মোকাবিলা করতে চোখ সিলিয়ারি পেশীকে সংকুচিত করে ও সিলিয়ারি বডির রিংটি ছোট হয়ে যায়। এর ফলে জোনুলার ফাইবারগুলি ঢিলে হয়ে গিয়ে লেন্স ক্যাপসুলের ওপর তাদের আকর্ষণ কমে যায়। লেন্স ক্যাপ্‌সুলটি স্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্য লেন্স এ অবস্থায় বর্তুলাকার হয়ে যায় অর্থাৎ এর তলের বক্রতা বেড়ে যায়। বক্রতা বাড়ার জন্য লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতা বা পাওয়ার বেড়ে যায় ও তখন কাছের থেকে আসা অপসৃত আলোক রশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে পড়ে। সিলিয়ারি বডি ও লেন্সের এই যৌথ ক্রিয়ায় চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতার প্রয়োজন মতো বাড়া-কমাকে অ্যাকোমডেশন বলে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় ও লেন্সের বিভিন্ন স্তরের প্রতিসরাঙ্কে পরিবর্ত্তন আসে। তখন কাছের জিনিস দেখার সময় সিলিয়ারি পেশী সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও লেন্সের তলের বক্রতা প্রয়োজন মত বাড়তে পারেনা ও আলোক রশ্মির ফোকাস বিন্দু রেটিনাতে না পড়ার জন্য দৃশ্য বস্তু ঝাপসা দেখায়। একেই চালশে বলে। বড় জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা এটা অনুভব করিনা কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিস (যেমন বইয়ের অক্ষর, সূচের ফুটো) অস্পষ্ট দেখায়। এক্ষেত্রে কাছের সূক্ষ্ম জিনিস স্পষ্ট দেখতে হলে চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা এই ঘাটতিটুকু পূরণ করতে হবে। এটা সম্ভব হয় যদি চশমার আকারে উপযুক্ত প্লাস পাওয়ারের লেন্স ব্যবহার করা হয়।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ যখন এই পড়ার চশমার ব্যবস্থা-পত্র দেন তখন তিনি প্রথমে চোখের দূরের দৃষ্টি পরীক্ষা করে নেন। দূরের যদি কোন প্রতিসরণ দোষ থাকে (যেমন দূরদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি) তাহ'লে তার সংশোধক লেন্সের পাওয়ারটি আগে ঠিক করে নেন। এটি প্লাস, মাইনাস, স্ফেরিক্যাল বা সিলিণ্ড্রিক্যাল কিংবা স্ফেরিক্যাল ও সিলিণ্ড্রিক্যালের সমন্বয় হতে পারে। তারপর এই দূরের পাওয়ারটি পরীক্ষার্থীর চোখে পরিয়ে রেখে তাঁর সামনে পড়ার দূরত্বের কোন পাঠ্যবস্তু (যেমন ছাপানো কার্ড) ধরা হয় ও দূরের পাওয়ারের ওপর প্লাস পাওয়ারের লেন্স যোগ করা হয়। যে মাত্রার প্লাস পাওয়ারের লেন্স পড়ার অক্ষর বা কোন সূক্ষ্ম বস্তু কিছুটা সামনে পেছনে করেও স্পষ্ট দেখায় তাকে

এডিসন (Addition) বলা হয় । দূরের পাওয়ারের ও এই এডিসনের যোগফলই হ'ল কাছের পাওয়ার । এই এডিসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুচোখে সমান হয় তবে ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নও হতে পারে । এই এডিসন সাধারণত +0.75Dsp থেকে +2.50Dsp পর্যন্ত হয়—যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে এর অনেক বেশিও হতে পারে । অর্থাৎ দূরের পাওয়ার যদি +1.00Dsp হয় ও কাছের জন্য যদি +1.50Dsp যোগ করতে হয় তাহ'লে কাছের পাওয়ার হবে +2.50Dsp আবার দূরের পাওয়ার যদি –3.00Dsp হয় ও কাছের দেখার জন্য +1.00Dsp যোগ করতে হয় তাহ'লে যোগ করার পর কাছের পাওয়ার হবে – 2.00Dsp ।

দুচোখের দূরের পাওয়ার যদি দুরকম হয় (আর সাধারণ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে) তাহ'লে দু চোখের কাছের পাওয়ার ও দুরকম হবে ।

সাধারণত পড়ার চশমা বাইফোকাল হিসাবে দেওয়া হয় । বাইফোকাল চশমায় একটি কাচেই ওপরের অংশে থাকে দূরের পাওয়ার ও নিচের অংশে পড়ার পাওয়ার । অর্থাৎ একই কাচে দুটি ফোকাস দূরত্বের দুটি লেন্স থাকে (২৫ নং ছবি) । এর জন্য একে বাইফোকাল বলা হয় । অনেক



বাইফোকাল লেন্স

২৫ নং ছবি

সময় তিনটি দূরত্বে দেখার প্রয়োজন হয় – খুব দূরের, মাঝামাঝি জায়গায় ও একদম সামনের এক্ষেত্রে ট্রাইফোকাল লেন্স বা একটি কাচে তিনটি ফোকাস দূরত্বের লেন্সের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় । এছাড়া Univis, varilux ইত্যাদি নানাধরনের বাইফোকাল বা মাল্টিফোকাল লেন্স হয় ।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন । একটা সাধারণ ধারণা আছে যে দূরের পাওয়ার সমসময় মাইনাস ও কাছের পাওয়ার সমসময়

প্লাস। কিন্তু যাঁদের দূরদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া আছে তাঁদের দূরের পাওয়ার প্লাস হবে এটা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু চশমায় কাছের পাওয়ারও প্লাস না হয়ে মাইনাস হতে পারে। ধরা যাক্ কোন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের দূরের পাওয়ার –5.00Dsp ও তাঁর কাছে দেখার জন্য +2.00Dsp যোগ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁর কাছের পাওয়ার হবে –3.00Dsp। বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এধরনের ব্যবস্থাপত্র পেয়ে অনেকে ভাবেন যে, ডাক্তারবাবু লিখতে ভুল করলেন নাকি – কাছের পাওয়ার মাইনাস কেন হ'বে ? আশাকরি ওপরের আলোচনা থেকে এই ভুল ধারণার নিরসন হবে। একই কারণে যাঁদের –3.00Dsp বা কাছাকাছি ক্ষীণদৃষ্টি আছে তাঁরা বিনা চশমাতেই পড়তে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায় যে চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে চালশের চশমা নেওয়া হল কিন্তু কয়েক বছর পর পড়ার জন্য আর চশমার প্রয়োজন হচ্ছে না – খালি চোখেই বইয়ের অক্ষর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এতে অনেকে চালশে কেটে গেছে ও চোখ ভালো হয়ে গেছে ভেবে উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এর কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের লেন্সের কাঠিন্য বেড়ে যায় (Lens sclerosis) ও তার প্রতিসরণ ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। আবার বয়সকালে চোখে ছানি পড়লেও লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতা বাড়ে ও ক্ষীণদৃষ্টি হয়। এই ক্ষীণদৃষ্টির মাইনাস পাওয়ার ও চালশের চশমার লেন্সের প্লাস পাওয়ার কাটাকাটি হয়ে যায় ও বিনা চশমায় পড়া যায়। আবার যদি হঠাৎ চালশের চশমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় ও চোখের লেন্সে উল্লিখিত কোন পরিবর্তন না হয় তাহ'লে তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ডায়াবেটিসে ক্ষীণদৃষ্টি হয় ও তখন চালশের চশমার আর প্রয়োজন না হতে পারে। এটা অবশ্য সাময়িক। রক্তের শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে গেলে আবার চশমার প্রয়োজন হবে এজন্য যাঁদের ডায়াবেটিস আছে তাঁদের চশমার জন্য চোখ পরীক্ষা করাবার সময় রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।

বৃদ্ধ বয়সে অনেকে বিনা চশমায় পড়তে পারেন ও তাঁরা বলেন যে যৌবনে খাঁটি 'ঘি, দুধ' খেয়েছেন বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আসল কারণটা কিন্তু অন্য। বার্ধক্যে চোখের পিউপিল বা তারারন্ধ্র ছোট হয়ে যায় ও ফলে ফোকাসের গভীরতা বেড়ে যায় ও বইয়ের অক্ষর

স্পষ্ট দেখায় (যাঁরা চালশের চশমা পরেন তাঁরা যদি একটা শক্ত কাগজে আলপিন দিয়ে ছোট ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে দেখেন তাহলে চশমা ছাড়াই বই-এর অক্ষর স্পষ্ট দেখতে পাবেন) । এছাড়া বেশি বয়সে চোখের লেন্সের কাঠিন্য বাড়ার জন্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে ছানি পড়ার জন্য ক্ষীণ দৃষ্টি হয় । এইসব কারণেই বই এর অক্ষর বিনা চশমাতেই স্পষ্ট দেখায় 'খাঁটি ঘি-দুধের' জন্য নয় ।

চশমার রক্ষণাবেক্ষণ

চশমা নেওয়ার পর তার যত্ন নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । চশমা নরম কাপড়ে মুড়ে (এই ধরনের কাপড় চশমার দোকান থেকেই পাওয়া যায়) খাপের মধ্যে রাখা উচিত । চশমা খোলা বা পরার সময় দুপাশ ধরে খোলা বা পরা উচিত – এক পাশ ধরে খুললে ফ্রেমের বিন্যাস (Adjustment) নষ্ট হয়ে যায় ও পরে চশমা পরে দেখতে অসুবিধা হয় ও মাথা ধরা বা চোখে ব্যথাও আরম্ভ হতে পারে । চশমা খুলে টেবিলে রাখার সময় লেন্সের ওপর ভর করে রাখা উচিত নয়, ফ্রেমের ডাঁটি দুটির ওপর ভর করে রাখতে হবে নাহলে লেন্সে দাগ পড়ে যাবে যা মুছলেও উঠবেনা । এছাড়া চশমার কাচ পরিষ্কার রাখা দরকার । চশমার কাচ পরিষ্কার করার জন্য ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয় এতে কাচ খারাপ হয়ে যেতে পারে । লাক্স বা সানলাইট জাতীয় সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে । কলের বা কুয়োর জলে কাচ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই চলবে । এরকম দিনে দু বার করলেই যথেষ্ট হবে । লেন্স পরিষ্কার করার নানা রকম সলিউশনও চশমার দোকানে পাওয়া যায় ।

কন্‌টাক্‌ট্‌ লেন্স (Contact lens)

কন্‌টাক্‌ট্‌ লেন্সের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে । চশমার লেন্স থাকে চোখের থেকে কিছুটা সামনে – কন্‌টাক্‌ট্‌ পরা হয় চোখের পাতার নিচে কর্নিয়ার ওপর । কর্নিয়ার সংসর্গে (Contact) থাকে বলে এর নাম কনটাক্‌ট্‌ লেন্স (অবশ্য কনটাক্‌ট্‌ লেন্স সরাসরি কর্নিয়ার ওপর থাকে না – লেন্স ও কর্নিয়ার মাঝে চোখের জলের একটি স্তর থাকে) ।

চশমায় কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় । যাঁদের চশমার লেন্সের পাওয়ার খুব বেশি তাঁদের স্পষ্টভাবে দেখতে হলে লেন্সের

কেন্দ্রস্থল দিয়ে দেখতে হয় – লেন্সের কিনারা দিয়ে দেখলে দৃশ্যবস্তু বিকৃত- ভাবে দেখা যায়। তাই সামনের কোন জিনিস দেখার সময় তার একটু পাশের কিছু দেখতে হলে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে হয়। কনটাক্ট্ লেন্সের ক্ষেত্রে যেহেতু লেন্সটি চোখের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে তাই এই অসুবিধা হয়না – লেন্সের পাওয়ার যত বেশিই হোকনা কেন। চশমার ক্ষেত্রে আর একটা অসুবিধা দেখা যায় দুটি লেন্সের পাওয়ারের তফাত খুব বেশি হলে। ধরা যাক একটি চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক ও অন্য চোখটির জন্য হাই পাওয়ারের লেন্সের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রেও চশমায় অসুবিধা হয়। কারণ দুটি চোখের রেটিনাতে দৃশ্য বস্তুটির যে দুটি ছবি পড়ে তা বেশ ছোট-বড় হয়ে যায় ও মস্তিষ্ক এই দুটি অসমান ছবিকে মেলাতে পারেনা ফলে দেখার অসুবিধা হয়। এরকম অবস্থায় অনেক সময় মস্তিষ্ক একটি চোখের (যেটি বেশি খারাপ) দৃষ্টিকে অবদমিত (supress) করে দেয়। চোখের এই অবস্থাকে অ্যামব্লাইওপিয়া (amblyopia) বলে। আবার যাঁদের এক চোখে ছানির অপারেশন হয়েছে (ও ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স দেওয়া হয়নি) ও অন্য চোখটির দৃষ্টি প্রায় স্বাভাবিক তাঁরা চশমা পরলে দুচোখ এক সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন না। এর কারণ অপারেশন করা চোখটির জন্য হাই প্লাস পাওয়ারের (+10.00Dsp বা তার কাছাকাছি পাওয়ারের) দরকার হয় ও চশমার দুটি লেন্সের পাওয়ারের খুব তফাত হয়ে যায়। এই কারণে দুটি চোখ এক সঙ্গে ব্যবহার করা যায়না। এক্ষেত্রে কন্টাক্ট্ লেন্সই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এছাড়া চশমার আরও নানা ছোটখাটো অসুবিধা ত আছেই। গরমের সময় ঘামের জন্য বা ঠিক মত ফ্রেম না হলে চশমা নাকের নিচের দিকে বারবার নেমে যায়। চশমার ফ্রেম থেকে অ্যালার্জিও হতে পারে। আর যাঁরা সৌন্দর্য সচেতন (বিশেষ করেন মহিলারা) তাঁরা চশমা পরার ব্যাপারটা সব সময় এড়িয়ে যেতে চান। অনেক সময় চশমার কাচে বাষ্প জমে গিয়ে বিরক্তিকর ফগিং (Fogging) ও হয়।

কন্টাক্ট্ লেন্স দু রকমের হয় – হার্ড ও সফট্। হার্ড লেন্স তৈরি হয় পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট (Poly methyal Methacrylate বা সংক্ষেপে PMMA) দিয়ে। হার্ড লেন্সের কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন এটি পরার স্বাচ্ছন্দ্য কম, এজন্য একটানা বেশিক্ষণ পরা যায়না দ্বিতীয় অসুবিধাটি হল কর্নিয়ার অক্সিজেন গ্রহণের অসুবিধা। কর্নিয়ার

অক্সিজেনের অভাব হ'লে এর কোষ কলায় জলীয় ভাগ বেড়ে যাবে ও এটি ফুলে উঠে এর স্বচ্ছতা কমে যাবে। তখন দৃষ্টি স্বভাবতই ঝাপসা হয়ে যাবে। আজকাল অবশ্য অনেক উন্নত ধরনের হার্ডলেন্স বেরিয়েছে যাতে এই অসুবিধাগুলি অনেকাংশে দূর করা হয়েছে।

সফ্ট্ কন্টাক্ট্ লেন্স তৈরি হয় ২ হাউড্রোক্সীইথাইল মিথাক্রাইলেট (2-hydroxyethyl metha crylate বা সংক্ষেপে HEMA দিয়ে। সফ্ট্ লেন্সএ জলীয় ভাগ বেশি হওয়ার জন্য এটি পরার স্বাচ্ছন্দ্য বেশি ও এর অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতাও বেশি। তবে সফ্ট্ কন্টাক্ট্ লেন্সে সিলিণ্ড্রিক্যাল পাওয়ার দেওয়ার অসুবিধা – একটু বেশি পাওয়ারের সিলিণ্ডার দরকার হলে তা দেওয়া যায় না। তাছাড়া সফ্ট্ লেন্স বেশি ভঙ্গুর। হার্ড লেন্সে বাই ফোকাল হয় কিন্তু সফ্ট্ লেন্সে হয়না।

কন্টাক্ট্ লেন্সে সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যেমন অ্যালার্জি। হার্ড বা সফ্ট্ কন্টাক্ট্ লেন্স পরিষ্কার করার জন্য যে সলিউশন ব্যবহার করা হয় তার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। এই সলিউশনগুলিতে যে রাসায়নিক বস্তু থাকে তা লেন্সের ওপর জমে যায় ও অ্যালার্জি শুরু হয়। এই জন্য লেন্স পরিষ্কার করার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। কন্টাক্ট্ লেন্সের আর একটি মারাত্মক অসুবিধা সংক্রমণ। সময় মত ব্যবস্থা না নিলে এই সংক্রমণ অনেক সময় ভয়ানক রূপ নেয়। এই জন্য কন্টাক্ট্ লেন্স খোলা বা পরার সময় সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া উচিত।

কমপিউটার দিয়ে চোখ পরীক্ষা :

কমপিউটার দিয়ে চোখ পরীক্ষার প্রচলন আজকাল হয়েছে। নানা ধরনের কমপিউটার বাজারে আছে যেমন Topcon Refractometer, 6600 Autorefractor, Diaptron II, Vision analyser ইত্যাদি।

প্রশ্ন আসে, কমপিউটার দিয়ে চশমার পাওয়ার পরীক্ষা কতটা সঠিক? কমপিউটার মানেই একটা ধারণা হয় যে সে যা বলবে তা নির্ভুল। এটা অন্য ক্ষেত্রে ঠিক হতে পারে কিন্তু চোখের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য সেটাই বিচার্য বিষয়। মনে রাখা দরকার যে মানুষের চোখ একটি জড় লেন্স বা মেসিন নয় যে নির্ভুলভাবে মাপজোক করে এর পাওয়ার বলে দেওয়া যাবে। কমপিউটারে চোখ পরীক্ষা করার সময় পরীক্ষার্থীকে ঠিক মত বসান, তাঁর সহযোগিতা করার ক্ষমতা, অ্যাকোমডেশন ও

সর্বপরি যিনি পরীক্ষা করছেন তাঁর কর্মকুশলতা ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার তারতম্য পরীক্ষার ফলকে প্রভাবিত করে এ-জন্য কমপিউটার একটি নির্দিষ্ট পাওয়ার দিতে পারে না – কয়েকটি সম্ভাব্য পাওয়ার দেয় বিজ্ঞানের ভাষায় একে Scatter বলে। আজকাল অবশ্য অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করে অ্যাকোমডেশনের সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া সবার প্রয়োজন একরকম হয়না। যাঁরা টাইপ করেন তাদের একটু দূর থেকে পড়তে হয়, আবার স্বর্ণশিল্পীরা খুব কাছ থেকে সূক্ষ্ম কাজ করেন। এই তারতম্যের কথা চশমার ব্যবস্থা দেবার সময় মনে রাখতে হয়। তাই কমপিউটারে যে পাওয়ার পাওয়া গেল তা সরাসরি প্রেসক্রিপশন করা যায়না বা উচিত নয়। তাছাড়া কমপিউটার শুধু চশমার পাওয়ার বলে দিতে পারে, চোখের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। ধরুন কমপিউ-টার কারুর চোখের পাওয়ার বলে দিল – 3.00Dsp কিন্তু ঐ পাওয়ারের চশমা পরে তিনি দেখতে পেলেন না কারণ দেখা গেল তাঁর চোখের অপ-টিক্ নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে বা ঐ ধরনের কোন অসুখ চোখে হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কমপিউটার নির্দেশিত চশমা করালে অর্থব্যয়ই সার হবে। চোখ পরীক্ষা করানোর উদ্দেশ্য শুধু চশমার পাওয়ার ঠিক করাই নয় – চোখের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যিনি শুধু কমপিউটার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করলেন তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় চোখে কোন রোগ আছে কিনা, তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন না। অনেক চোখের রোগ আছে প্রথম অবস্থায় যার কোন উপসর্গ থাকে না, তাই যাঁর এই রোগ হয়েছে তিনি বুঝতে পারেন না। যেমন ক্রনিক সিম্‌পল্ গ্লকোমা। যাঁর চোখে এই রোগটির সূত্রপাত হয়েছে তিনি যদি কমপিউটারে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নেন তাহ'লে প্রথম অবস্থায় হয়ত ঠিকই দেখতে পাবেন ও ভাববেন যে তাঁর চোখ ঠিক আছে। কিন্তু কয়েক মাস বা বছর কেটে যাবার পর যখন তাঁর পার্শ্বদৃষ্টি কমে আসবে ও তিনি অনুভব করবেন যে তাঁর চোখের কোন গোলমাল হয়েছে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। অথচ প্রথম অবস্থায় যদি তিনি চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে চোখ পরীক্ষা করাতেন তাহ'লে প্রথমেই এটা ধরা পড়ত ও চোখকে একটা বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান যেত। তাই কমপিউটার কখনই চিকিৎসকের ভূমিকা নিতে পারে না।

অবশ্য কমপিউটারের প্রয়োজন নেই একথা বলা হচ্ছে না। কমপিউটার ব্যবহার করে চশমার পাওয়ার পরীক্ষার প্রাথমিক অংশটুকু অতি অল্প

সময়ে ও অল্প আয়াসে করা যায় ও এতে সময় বাঁচে। তবে পরীক্ষায় যে পাওয়ার পাওয়া যাবে তা সবসময়ই যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁকে পরিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে ও প্রয়োজনীয় অদল-বদল করতে হবে। আর বছরে অন্তত একবার বিশেষজ্ঞ দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। চোখের পাওয়ার সম্পর্কে গণসমীক্ষার ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য ও এর ব্যবহার এ ক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়বে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার, অনেকে চশমার দোকানের অপটিশিয়ানকে দিয়ে চশমার পাওয়ার পরীক্ষা করান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের কোন প্রশিক্ষণ থাকে না। এঁদের হাতে চোখ ছেড়ে দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

প্রতিসরণ দোষ ও শল্য চিকিৎসা

প্রতিসরণ দোষের সংশোধনে আজকাল শল্য চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। আগে অনেক রকম অপারেশন করা হয়েছে কিন্তু অধুনা যে অপারেশন করা হয় তাকে বলে রেডিয়াল কেরাটোটমি (Radial Keratotomy)। এটি মাইয়োপিয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য হল কর্নিয়ার বক্রতা কমিয়ে আনা। আমরা দেখেছি যে কর্নিয়ার বক্রতার ওপর মাইয়োপিয়ার মাত্রা নির্ভর করে। কর্নিয়ার বক্রতা যদি কমিয়ে আনা যায় তাহ'লে মাইয়োপিয়ার মাত্রাও কমে যাবে। এটা করা হয় কর্নিয়ার মাঝখানের খানিকটা অংশ ছেড়ে দিয়ে কর্নিয়ার ব্যাসার্ধ বরাবর সরল রেখায় আট থেকে ষোলটি ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই ক্ষতের গভীরতা থাকে কর্নিয়ার প্রস্থের শতকরা ৪০ ভাগ ও এজন্য এক বিশেষ ধরনের হীরের ছুরি ব্যবহার করা হয়। ক্ষতগুলি যখন শুকিয়ে আসে কর্নিয়ার বক্রতাও তখন কমে যায়। দেখা গেছে 5-6 ডাইওপটার মাইয়োপিয়ার ক্ষেত্রে অপারেশনের ফল খুব ভাল হয় – অপারেশনের পর প্রায় ক্ষেত্রেই আর চশমা পরতে হয়না। তবে বেশি মাত্রায় মাইয়োপিয়ার ক্ষেত্রে (যেমন (–10Dsp বা তার বেশি) কিছুটা মাইয়োপিয়া থেকে যায় ও তার জন্য চশমা পরতে হয়। আর এই অপারেশনে চশমার লেন্সের পাওয়ারই শুধু কমানো যায়, চোখের স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন হয়না। যেমন প্রগ্রেসিভ মাইয়োপিয়াতে যদি রেটিনার অবক্ষয় থাকে তাহলে এই অপারেশন শুধু চশমার পাওয়ারই কমাবে, দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে না। আর excimer laser এর যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তা যদি

বাস্তবায়িত হয় তাহলে এধরনের অপারেশনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

রাশিয়াতে ফিয়োদোরভের নেতৃত্বে দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রেও লেসার রশ্মি ব্যবহার করে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া গেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

চোখ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১। বাচ্চাদের ট্যারা হওয়াটা কি সুলক্ষণ ?

না। যদি আপনার বাচ্চা ট্যারা হয় তাহলে এখনই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, নাহলে পরে আপসোস করতে হবে।

আমাদের প্রতিটি চোখে ছটি করে পেশী আছে যাদের সংকোচন শ্লথনের ফলে আমরা বিভিন্ন দিকে চোখ ঘোরাতে পারি। দুটি চোখের পেশীগুলি সুসংবদ্ধভাবে কাজ করে, ফলে চোখ ঘোরানোর সময় দুটি চোখ একই দিকে ঘোরে। ডান দিকে তাকালে দুটি চোখ এক সঙ্গে ডান দিকে ঘোরে, বাঁ দিকে তাকালে বাঁ দিকে। একটি চোখকে ডান দিকে ও অন্যটিকে বাঁ দিকে ঘোরান সম্ভব নয় (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন)। এর ব্যতিক্রম হয় একমাত্র পড়াশুনা করা বা সম দূরত্বের কোন কিছু দেখার সময়, যখন দুটি চোখই ভেতরের দিকে ঘুরে যায় – ডান চোখ বাঁ দিকে ও বাঁ চোখ ডান দিকে। একে চোখের Convergence বা অভিসৃতি বলে।

আমরা যখন কোন কিছু দেখি তখন দুটি চোখ দিয়ে একসঙ্গে দেখি – একে বলে দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision)। ত্রিমাত্রিক দৃষ্টির (Steriovision) জন্য, যেমন দূরে হেঁটে যাওয়া দুটি মানুষের মধ্যে কে আগে কে পেছনে, তা বোঝার জন্য দুচোখ দিয়ে এক সঙ্গে ও প্রায় সমান ভাবে দেখার প্রয়োজন। তাছাড়া দুচোখ দিয়ে দেখলে দৃশ্য পটের ব্যাপৃতি ও দৃষ্টিশক্তি বেশি হয়। তাই দূরে দেখার সময় দুচোখের দর্শন-দৃগক্ষ(Visual axis) পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল থাকা দরকার। এটা না হলেই তির্যক দৃষ্টি বা ট্যারা (Squint) হয়েছে বলা হয়।

ট্যারা হওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে যার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন এখানে নেই। দু একটির কথা এখানে বলা হচ্ছে।

চোখের কোন একটি পেশী যদি দুর্বল বা অকেজো হয়ে যায় তাহলে ঐ পেশীটি চোখটিকে যেদিকে ঘোরায় সেদিকে তাকালে ট্যারা ভাব দেখা দেবে ও সামনে তাকালেও চোখটি ডাইনে বাঁয়ে ওপরে বা নিচে ঘুরে থাকবে – কোন দিকে ঘুরবে তা নির্ভর করবে কোন পেশীটি অকেজো হয়েছে তার ওপর। শিশু জন্মাবার সময় মাথায় চাপ লেগে বা জন্মগতভাবে চোখের একটি বা বেশি পেশী ঠিকমত তৈরি না হলে এরকম হয়। আবার বিভিন্ন কারণে বেশি বয়সেও এরকম হয় – যেমন উচ্চ রক্তচাপে বা ডায়াবেটিসে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে।

বাচ্চাদের ট্যারা হওয়ার আর একটি কারণ প্রতিসরণ দোষ। দুটি চোখের প্রতিসরণের মধ্যে যদি বেশি মাত্রায় অসাম্য থাকে, যেমন শিশুর যদি একটি চোখে অন্য চোখের তুলনায় বেশি মাত্রায় দীর্ঘদৃষ্টি থাকে তাহলে দেখার সময় এই চোখটিকে অ্যাকোমডেশন বেশি করতে হয় ও চোখটি ভেতরের দিকে ঘুরে যায়। যদি পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে চশমা দিয়ে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক রাখা না হয় তাহলে ঐ চোখটিতে দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়না (Amblyopia) ও পরে চশমা দিয়েও দৃষ্টির উন্নতি হয়না ও ট্যারা ভাবটিও থেকে যায়। কিন্তু যদি ঠিক সময় চশমা দেওয়া হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি ব্যহত হওয়া বা ট্যারা হওয়া থেকে শিশু রেহাই পেতে পারে। তাই ট্যারাভাব লক্ষ্য করলেই শিশুর বয়স যত কমই হোক্ না কেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

চশমা দিয়ে অবশ্য সব সময় সব ধরনের ট্যারাভাব সারান যায় না – কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

২। টেলিভিশন দেখা কি খারাপ ?

টিভি থেকে আসা বিকিরণ আমাদের শরীরের কতটা ক্ষতি করতে পারে তা বলার আগে বিকিরণের অন্যান্য উৎসগুলির কথা আলোচনা করা যাক। আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের আমল থেকেই কয়েকটি প্রাকৃতিক বিকিরণের আমরা শিকার। যেমন নভোরশ্মি (Cosmic rays)। এই রশ্মিগুলির সৃষ্টি হচ্ছে সূর্যে ও মহাবিশ্বে বিভিন্ন তারায় তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে। নভোরশ্মি সব সময় আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে ও সারা বছরে আমাদের শরীরে যাচ্ছে 45 মিলিরেম (Rem=Roentgen Equivalent Man)। এছাড়া মাটিতে

আছে থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম 40 ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ যা থেকে বিকিরণ আমাদের শরীরে যাচ্ছে বছরে 15 মিলিরেম। পানীয় জল, খাবার ও বাতাস থেকে আসে বছরে 25 মিলিরেম । আমাদের বাসভবন যে পাথর কাঠ প্লাস্টার দিয়ে তৈরি তা থেকে আসে বছরে 50 থেকে 100 মিলিরেম। বুকের এক্সরে করানোর সময় প্রতিবার আমাদের শরীরে ঢোকে 20 মিলিরেম বিকিরণ । এমনকি আমরা যে চশমা পরি তার কাঁচ সিলিকা বা অন্য যে সব পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় তাতে প্রায়শই মিশে থাকে তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম। এই কারণে ইউ - এস অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাক্চারিং অ্যাসোসিয়েশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চশমার কাঁচে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাত্রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে রাজী হয়েছেন যাতে কেউ যদি দিনে ষোল ঘন্টা চশমা পরেন তাহলে যেন বছরে 500 মিলিরেমের বেশি বিকিরণ তাঁর কর্নিয়াতে প্রবেশ না করে। এখন দেখা যাক্ টিভি থেকে কতটা বিকিরণ আসে (কালার টিভি হলেও)। প্রথম যখন কালার টিভি বাজারে আসে তখন তার বিকিরণ ক্ষমতা ছিল খুব বেশি । ইনটারন্যাশ্ন্যাল কমিটি অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশন্ (IRCP) টিভির বিকিরণের মাত্রা বেঁধে দেন । তাঁদের নির্দেশ মত টিভির পর্দা থেকে 2 ইঞ্চি দূরে বিকিরণের মাত্রা হবে ঘণ্টায় 0.5 মিলিরেম। এর ফলে ঊনিশ শ সাতষট্টি সালে জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানি বাজার থেকে তাঁদের নব্বই হাজার টিভি ফেরত নিতে বাধ্য হন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মাত্রাকে কমিয়ে 0.1 মিলিরেম করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একজন দর্শক বার ফিট্ দূর থেকে টিভি দেখলে বছরে পুরুষ দর্শকের শুক্রাশয়ে 1 মিলিরেম ও মহিলারা দর্শকের ডিম্বাশয়ে .33 মিলিরেম বিকিরণ যায়। এই মাত্রা অতি সামান্য। যাঁরা চকচকে পাতাওয়ালা (Glossy paper) ম্যাগাজিন বা বই পড়েন (ম্যাগাজিন বা বই 14 ইঞ্চি দূরে রেখে) তাঁরা এর কুড়ি গুণ বিকিরণ শরীরে নেন কারণ কাগজকে চকচকে করার জন্য অল্প মাত্রায় থোরিয়াম ও রেডিয়াম ব্যবহার করা হয়। সুতরাং টিভি দেখা বন্ধ করে আমাদের কতটুকু লাভ হবে ? তাছাড়া দেখা গেছে আমাদের শরীর বছরে 5000 মিলিরেম পর্যন্ত বিকিরণ সহ্য করতে পারে – কোন ক্ষতি হয়না। সুতরাং টিভি দেখা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। তবে কম করে দশ ফিট দূর থেকে দেখতে হবে। আর ঘরে অন্তত 40 ওয়াটের একটি বাল্ব জালিয়ে রাখতে হ'বে কারণ অন্ধকার ঘরে টিভির glare বেশি

হ'বে ও চোখ তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হ'য়ে যাবে। আর, বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার ক্ষতি করে টিভি দেখবে না।

৩। চোখের জন্য কি মাথা ধরে ?

চোখ থেকে মাথা ধরে দুটি কারণে। প্রথমত চোখে বা অক্ষিকোটরে (Orbit) যদি কোন অসুখ হয় (যেমন অ্যাকিউট কনজেস্টিভ গ্লকোমা, আইরিডো সাইক্লাইটিস, কেরাটাইটিস, অরবিটাল টিউমার বা সেলুলাইটিস)। তখন চোখে, চোখের পেছনে, চোখের আশে পাশে, ভ্রূ, কপাল ও রগে ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে মাথা ধরার উৎস বা হেতুটি দূর হলেই মাথাধরা সেরে যায়।

দ্বিতীয়ত চোখে প্রতিসরণ দোষ থাকলে অর্থাৎ চশমার প্রয়োজন থাকলে মাথা ধরতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, প্রতিসরণ দোষ যদি খুব বেশি থাকে তাহলে মাথা ব্যথা বিশেষ হয়না – অল্প মাত্রায় প্রতিসরণ দোষেই মাথা ব্যথা বেশি হয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, বেশি মাত্রায় প্রতিসরণ দোষ চোখ তার নিজস্ব অ্যাকোমডেশনের দ্বারা ঠিক করে নিতে পারে না তাই চোখ এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে অল্প মাত্রায় প্রতিসরণ দোষ চোখ তার নিজস্ব অ্যাকোমডেশন প্রয়োগ করে ঠিক করে নিতে পারে তাই চোখ সবসময় এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এর ফলে চোখের পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, 'আই স্ট্রেন' হয় ও মাথা ধরে। দেখা গেছে প্লাস স্ফেরিক্যাল বা সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্সের প্রয়োজন থাকলে মাথা ধরা বেশি হয়। মাইনাস স্ফেরিক্যাল লেন্স যাঁদের প্রয়োজন চশমা না পরলে তাঁদের দৃষ্টি ঝাপসা হয় – মাথা ব্যথা হয়না। কথাগুলি অবশ্য সাধারণ ভাবে বলা হচ্ছে – প্রতিটি ক্ষেত্রে যে এটি হবেই তা বলা যাবে না।

অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার আগে মাথাধরা আরম্ভ হয়। চোখ পরীক্ষা করে কোন প্রতিসরণ দোষ পাওয়া যায়না অথচ মাথা ব্যথা চলতেই থাকে। শরীর বা চোখের দুর্বলতা এর কারণ হতে পারে। অনেক সময় অবশ্য কারণটা হয় মানসিক। পড়াশোনায় খুব ভাল অথচ সামনের পরীক্ষায় এখনো খুব ভাল তৈরি হয়নি – এরকম ক্ষেত্রে নিজের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া ও অভিভাবকদের হতাশ করার ভয় থেকে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় ও অবচেতন মন তখন মাথা ধরার মধ্যে নিষ্ক্রতির একটা পথ পায়। এক্ষেত্রে অভিভাবকরাই একমাত্র চিকিৎসক।

তাঁদের সন্তানকে একথা বোঝাতে হবে যে প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফল করার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারেনা আর একটা পরীক্ষার ফল খারাপ হ'লেই সে খারাপ ছাত্র বা ছাত্রী তার প্রমাণ হয়না।

৪। সূর্যগ্রহণ দেখা কি চোখের পক্ষে খারাপ ?

অবশ্যই খারাপ। এতে চোখের রেটিনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সূর্যগ্রহণের সময় যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় তখন চোখের পিউপিল বা তারারন্ধ্র বড় হয়ে যায় কারণ আমরা আগেই জেনেছি (প্রথম পরিচ্ছেদে) যে আলো বেশি বা কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিউপিল যথাক্রমে ছোট বা বড় হয়ে যায় ও এই ভাবে পিউপিল চোখে প্রবেশ করা আলোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্যগ্রহণ যখন শেষ হয়ে আসে অর্থাৎ সূর্য যখন চাঁদের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করে তখন যদি আমরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো চোখে পড়ে। এটা এতই হঠাৎ করে হয় যে পিউপিল ছোট হয়ে গিয়ে ঐ বাড়তি আলোকে আটকাবার সময় পায়না। এর ফলে হঠাৎ বেশি পরিমাণে সূর্য রশ্মি আমাদের চোখে প্রবেশ করে ও এর ফোকাস বিন্দু রেটিনার যেখানে পড়ে সেখানটা পুড়ে গিয়ে অকেজো হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যদিও কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় না কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দৃষ্টির স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। এজন্য সূর্যগ্রহণ কখনই দেখা উচিত নয়। অনেকে জলে প্রতিবিম্ব ফেলে বা কাল চশমা পরে দেখেন কিন্তু তাতেও কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই। সূর্যগ্রহণ যদি দেখতেই হয় তাহলে একমাত্র পিনহোল ক্যামেরার সাহায্যে সাদা দেওয়ালে বা পর্দায় ছায়া ফেলে দেখা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওয়েলডিং ফ্ল্যাশ্ বা শর্ট্ সার্কিটের ফলে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ্ লেগেও রেটিনার এই ধরনের ক্ষতি হতে পারে। আর যাঁরা দুই বেলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্য প্রণাম করেন তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে এতেও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

৫। ডায়াবেটিসে কি চোখের ক্ষতি হয় ?

ডায়াবেটিসে চোখের ক্ষতিতো হয়ই, এছাড়া মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, কিডনি ও নার্ভের ক্ষতি হয়। পায়ে গ্যাংগ্রিনও হয়।

চোখের প্রতিটি অংশে ডায়াবেটিসের ফলে ক্ষতি হতে পারে। তার

মধ্যে একটি হল লেন্স। আমরা চোখের প্রতিসরণ এটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে চোখ ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায়। বেশি দিন ধরে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে থাকলে চোখে ছানিও পড়তে পারে। ডায়াবেটিসে গ্লকোমাও হয়। অনেক সময় চোখের মাংশ পেশীর সংবাহক নার্ভ অসুস্থ হয়ে গিয়ে একটা জিনিস দুটো দেখায়। তবে ডায়াবেটিসে সব থেকে মারাত্মক ক্ষতি হয় রেটিনাতে। রেটিনায় রক্ত-ক্ষরণ হয় ও এক্জুডেট জমে। রক্তের ধমনীর দেওয়াল দুর্বল হয়ে গিয়ে মাইক্রো অ্যানিউরিজম্ হয়। অনেক সময় নতুন রক্তের ধমনী ভিট্রোয়াসের দিকে এগিয়ে যায় ও ভিট্রেয়াসে রক্তক্ষরণ হয়। রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে। তাই প্রথম থেকে সাবধান না হলে ডায়াবেটিসের পরিণাম অন্ধত্বও পর্যন্ত গড়াতে পারে। মনে রাখা দরকার যে একজন ডায়াবেটিস রুগীর অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা এক জন সুস্থ লোকের থেকে কুড়ি গুণ বেশি। এইজন্য যাঁদের ডায়াবেটিস আছে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখতেই হবে আর বছরে অন্তত দুবার বিশেষজ্ঞ দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। ডায়াবেটিস যত দীর্ঘস্থায়ী হবে চোখে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ততই বেশি। এখানে আমরা ডায়াবেটিস বলতে অবশ্য ডায়াবেটিস মেলিটাস-এর কথা বলছি।

৬। আইরাইটিস রোগটি কী ?

আইরাইটিস এর অর্থ আইরিশের প্রদাহ। তবে শুধু আইরিশের প্রদাহ এককভাবে খুব কমই হয় এর সঙ্গে সাধারণত সিলিয়ারি বডিও জড়িয়ে পড়ে – তখন তাকে বলা হয় আইরিডোসাইক্লাইটিস। আবার আইরিশ, সিলিয়ারি বডি ও কোরয়েড অর্থাৎ একসঙ্গে সমস্ত ইউভিয়ার প্রদাহ – প্যানইউভিআইটিসও হতে পারে।

আইরিডোসাইক্লাইটিস-এ চোখ লাল হয়, ব্যথা হয় ও এই ব্যথা হঠাৎ ও প্রচণ্ড আকারে হতে পারে। এর সঙ্গে কর্নিয়ার প্রদাহ হলে (কেরাটোইউভিআইটিস) চোখ দিয়ে জল পড়ে ও আলো সহ্য হয়না। প্রথমেই চিকিৎসা না করালে দৃষ্টিরও ক্ষতি হয়। কোরয়েডের প্রদাহ দৃষ্টির ওপর বেশি প্রভাব ফেলে বিশেষ করে যদি এটা ম্যাকুলা অঞ্চলে হয়। এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই চোখের সামনে একখণ্ড ধূসর বা কাল মেঘের মত দেখা যায়। ইউভিআইটিসের সময়মত চিকিৎসা না হলে নানা রকম

জটিলতার সৃষ্টি হয় (যেমন সেকেণ্ডারী গ্লকোমা) ও এর ফলে দৃষ্টির স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

আইরিডোসাইক্লাইটিস রোগের একটি অসুবিধা, এটি বার বার হতে পারে। বিশেষ করে শরীরে কোন অসুখ থাকলে যেমন সারকয়ডোসিস, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি। সেজন্য এর সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭। রেটিনার ডিটাচমেন্ট কাকে বলে ?

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে দেখেছি যে চোখের তিনটি আবরণের সব থেকে ভেতরেরটিকে বলে রেটিনা যা কোরয়েডের সঙ্গে আটকানো থাকে। কোরয়েডের সঙ্গে রেটিনার যে স্তরটি আটকান থাকে তাকে বলে রেটিনার পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে বাকি রেটিনা এই পিগমেন্ট স্তর থেকে সরে আসে আর সে অবস্থাকে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বা সেপারেসন্ বলে।

বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে। চোখে আঘাত লাগলে অনেক সময় রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয় আবার রেটিনার অবক্ষয়ে (যেমন প্রগ্রেসিভ মাইয়োপিয়ায়) রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয়। অনেক সময় ভিতর থেকে রেটিনার ওপর ভিট্রেয়াসের আকর্ষণের ফলে রেটিনা কোরয়েড থেকে সরে আসে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে চোখের সামনে আলোর ফুলকি দেখা যায় ও ছোট ছোট কাল বিন্দুর মত চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এই বিন্দুগুলিকে ভিট্রেয়াস ওপাসিটি বলে। অবশ্য ভিট্রেয়াস ওপাসিটি রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ছাড়াও হতে পারে।

ক্ষীণদৃষ্টিতে বা স্বাভাবিক চোখেও অনেক সময় ভিট্রেয়াসে অস্বচ্ছ কণার সৃষ্টি হয় ও এগুলি রেটিনার ওপর ছায়া ফেলে, ফলে চোখের সামনে কাল কাল কিছু ভাসছে বলে মনে হয়। এগুলি দেখতে বিন্দুর মত, সুতোর মত বা মাকড়সার জালের মত হতে পারে। চোখ বন্ধ রেখে জোরাল আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও এগুলি দেখা যেতে পারে। রেটিনাল ডিটাচমেন্টে এগুলি হঠাৎ বৃষ্টির ধারার মত দৃষ্টিপথে ঝরে পড়ে। রেটিনাল ডিটাচমেন্টের একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন ও এটি যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভাল।

৮। এইড্স্ রোগে কি চোখের ক্ষতি হ'য় ?

এইড্স্ বা অ্যাকোয়ারড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (Acquired immune deficiency syndrome — AIDS) এক ধরনের ভাইরাস সংক্রমণ। মনে করা হয়, এক বিশেষ প্রজাতির – আফ্রিকান বাঁদর (আফ্রিকান গ্রিন মাংকি – সার্কোপিথেকাস ইথিঅপস্) থেকে এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ও কিছু জীনগত পরিবর্তনের পর এই ভাইরাস রোগ সৃষ্টিকারী ভূমিকা নেয়। আফ্রিকা থেকে এই রোগ আসে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ও সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে। আমাদের দেশেও এটি এখন ছড়িয়ে পড়েছে।

আগে মনে করা হত যে সমকামীদের মধ্যেই এই রোগ হয় কিন্ত পরে দেখা গেছে যে এই রোগ ড্রাগ আসক্তদের ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন থেকে, ব্লাড ট্রান্সফিউসন থেকে, এইডস রোগাক্রান্ত মায়ের শিশুর, আক্রান্ত পুরুষের-স্ত্রীর, হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির (যাঁদের ব্লাড ট্রান্সফিউসন নিতে হয়) হ'তে পারে।

এইড্স্ ভাইরাসের নাম হিউমান-টি-লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস থ্রি (HTLV-III) বা হিউমান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV)। এই ভাইরাস সরাসরি রোগের সৃষ্টি বিশেষ করেনা। আমাদের শরীরের একটা সহজাত রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বা ইমিউনিটি আছে যা রক্তের দু ধরনের শ্বেত কণিকা – টি ও বি লিম্ফোসাইট এর মাধ্যমে কার্যকারী হ'য়। এইড্স্ ভাইরাস এক বিশেষ ধরনের টি-লিম্ফোসাইট ধ্বংস করে ফলে সংক্রামিত ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়, অতি সহজেই সে বিভিন্ন সংক্রমণের শিকার হ'য়ে পড়ে, যেগুলি সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে প্রতিরোধ করতে পারত। তাই শরীরের অন্যান্য অসুখের সঙ্গে চোখও সহজে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এইড্স্ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চোখের রেটিনাতেই বেশি রোগ হয়। যেমন কটন উল প্যাচ। উচ্চরক্তচাপ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগেও এটা হয় কিন্তু এইড্স্ রুগীদের ক্ষেত্রে এর প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া রেটিনাতে যে রোগগুলি দেখা যায় সেগুলি হ'ল রেটিনাল হেমোরেজ, সাইটোমেগালো ভাইরাস রেটিনাইটিস, টক্সোপ্লাসমসিস ইত্যাদি। কন্জাংক্টাইভায় দেখা যায় এক ধরনের ম্যালিগ্নান্ট রোগ – কাপোসি সারকোমা। এটা দেখে অনেক সময় সাবকনজাংক্টাইভাল হেমোরেজ বলে ভুল হয়। এ রোগটি এইড্স্ আক্রান্তদের বেশি হ'য়।

এছাড়া আইরিডোসাইক্লাইটিস, অ্যানেটিরিয়ার ভিট্রেআইটিস, হারপিস সিম্প্লেক্স বা জোস্টারও হ'তে পারে। মনে রাখতে হবে এই রোগগুলি যে কোন লোকের হ'তে পারে তবে এইড্স্ রুগীদের বেশি হ'য়।

এইড্স্ রোগ যা মানুষকে মৃত্যুর দরজায় পৌছে দেয় তার কোন সন্তোষজনক চিকিৎসা আজ পর্য্যন্ত বেরোয়নি। কিছু কিছু ওষুধ যেমন, জাইডোভুডিন বা অ্যাজাইডোথাইমিডিন ("রেট্রোভির") অনেকটা কার্যকর। তবে এ নিয়ে যে দ্রুতগতি ও ব্যাপক গবেষণা চলছে তাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে অতীতের অনেক দুরারোগ্য রোগের মত এটিও মানুষের কাছে পরাজিত হবে।

ডাঃ শচীদুলাল সরকার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করার পর ভিয়েনায় যান স্নাতকোত্তর-প্রশিক্ষণের জন্য। সেখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডি ও এম এস পরীক্ষা পাশ করেন ও ভিয়েনা অ্যাকাডেমীর তৎকালীন চক্ষুবিভাগের অধিকর্তা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসক প্রফেসর এ. পিলাট দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হন। এরপর তিনি বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নেন। একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যামাইকায় ইউনিভারসিটি কলেজ হসপিটালে চক্ষু বিভাগের রেজিস্ট্রার ছিলেন।

ডাঃ সরকার বর্তমানে দুর্গাপুরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। বর্ধমান ও তার আশপাশের কয়েকটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর পশার। এ অঞ্চলে "ডাঃ এস ডি সরকার" একটি অতিপরিচিত নাম।